স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
২ মে, ২০১১, ১৮ বৈশাখ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা

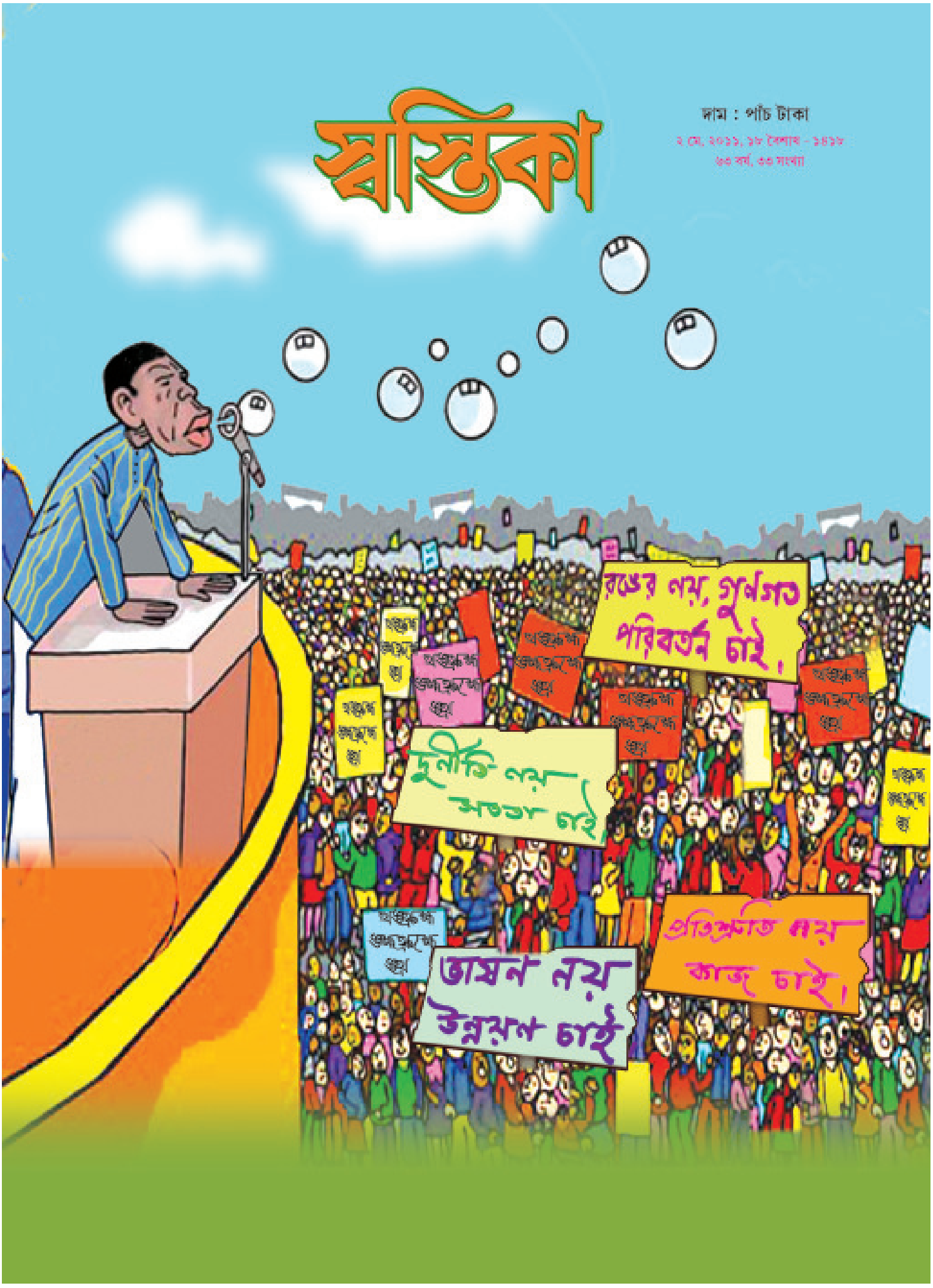

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

মিথ্যাচার, কেচ্ছা, কুৎসা রটনা কমিউনিস্ট কালচার ❑ ৮

সি পি এম মরিয়া হয়ে আবোল—তাবোল বকছে ❑ ৯

বাংলার খাস তালুকে বিপর্যয়, সি পি এমের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে ❑ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ১১

একটি দেশ— যেখানে কোনও নেতা নেই ❑ এম ভি কামাথ ❑ ১৩

পরিবর্তন চাই, না উন্নয়ন চাই ❑ দেবব্রত চৌধুরী ❑ ১৭

জনগণের নাম করে জনবিরোধী কাজে সেরা সি পি এম ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑ ২০

যোড়শ মহাজনপদ ঃ অস্মক ❑ গোপাল চক্রবর্তী ❑ ২৪

বোধন ঃ নিজের উপর আস্থা এবং মনের জোর ❑ চতুর্থ পাণ্ডব ❑ ২৫

বাংলাদেশের আয়নায় ❑ ২৭

এবারের বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল ৫-০ না ০-৫? ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑
জনমত : ২৩ ❑ **নবাঙ্কুর : ২৭** ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮** ❑
রঙ্গম : ৩১ ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩** ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রঙের নয়, গুণগত পরিবর্তন চাই ঃ ১৪

৬৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১৮ বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২ মে - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

সম্পাদকীয়

নির্বাচনে কালো টাকা

নির্বাচন জীবনের ধর্ম। অসত্যকে অসুন্দরকে আমরা বর্জন করি। গ্রহণ করি সত্যকে, সুন্দরকে। এই গ্রহণ বর্জন পালনের মধ্য দিয়াই চলিতেছে জীবন ও জগতের ক্রমবিকাশ। নির্বাচন যে স্থানে নিষিদ্ধ, জীবন সেই স্থানে গতিরুদ্ধ। গণতন্ত্র সার্বিক বিকাশের অঙ্গীকার, নির্বাচন সেই গণতন্ত্রেরই প্রাণ। গণতন্ত্রেই মুক্তি। যেখানে গণতন্ত্র নাই সেখানে একনায়কতন্ত্র। জীবনও সেখানে অবরুদ্ধ। বিশ্বের কোনও কোনও কমিউনিস্ট দেশেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু সেখানে শাসন ক্ষমতা যাহাদের কুক্ষিগত, জনগণকে বাধ্য করা হয় তাহাদের ভোট দিতে। কারণ সেখানে শাসকদলের মনোনীত তালিকার বাহিরে কেহ প্রার্থী হইতে পারে না। সেই স্থানে শাসকদল ব্যতীত দ্বিতীয় দল নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা আজ অসম্ভব বলিয়াই এইখানে ভোট দুর্বৃত্তদের ছলনার আশ্রয় লইতে হয়। একথা সত্য ও সর্বজনবিদিত যে গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কে বা কাহারা পরিচালিত করিবে তাহার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত ও ভোটাধিকারের ওপর; তাহার সততা, ন্যায়নীতি ও বিচারবোধের উপর। এই সততা ন্যায়নীতি বিচারবোধ যদি অবাধ না হয়, পরিবর্তে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, কৌশল বা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে এই ভোটাধিকার ব্যবস্থাকে কলুষিত করা হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র তাহার তাৎপর্য হারায়। 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো' এই ন্যায়সম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সহজ নীতিবোধ এবং সততার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ভোট পরিচালনায় পুলিশ এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ ও সক্রিয় সহযোগিতা করিবেন এটাই কাঙ্ক্ষিত। ইহার অন্যথা হইলেই গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না। হইয়া ওঠে দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লড়াই। আজ পেশীবল এবং অর্থবলই ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হইবার ফলে সাধারণ মানুষ ভোটদানের আগ্রহটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মানুষের এই অনাগ্রহ সুস্থ সমাজ ও প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। ভোট আজ উৎসবে পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য ভোটে রাশি রাশি কালো টাকা ব্যবহার হইতেছে। সারা বছর ধরিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। গত অক্টোবর মাসে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সভায় প্রকাশ্যেই এক কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া একলক্ষ এগারো হাজার একশত এগারো টাকা তাঁহার হাতে দান হিসাবে তুলিয়া দিয়াছিল। সিঙ্গুরের জমি সস্তায় হাতাইবার জন্য টাটা কোম্পানি কত টাকা সিপিএম পার্টি ফান্ডে দিয়াছিল সে রহস্য এখনও উন্মোচিত হয় নাই। নন্দীগ্রামের জমি লুঠ করিবার জন্য বিদেশি বণিক সালিম কত টাকা ঘুষ দিয়াছিল সে রহস্যও কি উন্মোচিত হইয়াছে? আজ ফাঁদে পড়িয়া সিপিএম দল কালো টাকা লইয়া সাধু সাজার প্রয়াসে মগ্ন হইয়াছে কোন্ সাহসে? গ্রামাঞ্চলের হার্মাদ শিবিরগুলি তো চলিতেছে কালো টাকার সাহায্যেই। বিহার, ঝাড়খণ্ড অথবা এই রাজ্যের অন্য জেলা হইতে যে সমস্ত বহিরাগতদের ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে বিরোধীদের জব্দ করিবার জন্য তাহা কি সরকারি খরচে চলিতেছে, না আদায়ীকৃত কালো টাকার সাহায্যে? বিগত চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া শাসক দল কালো টাকার রমরমা দেখাইয়াছে। আজ ক্ষমতায় আসিবার তাড়নায় বিরোধীদলও তাহা রপ্ত করিতে চাহিতেছে। ক্ষমতায় আসিবার পূর্বে যে দলের ভুসো কালিতে পোস্টার লিখিবার সময়ও অর্থের জন্য দশবার ভাবিতে হইত, আজ চৌত্রিশ বৎসর পর পাড়ায় পাড়ায় তাহাদের প্রাসাদোপম বাড়ি হইল কোন টাকায়? শাসকদল বলিয়া থাকেন জনগণ স্বেচ্ছায় তাহাদের দান করিয়াছে। বিরোধীরাও আজ একই কথা বলিতেছে। কথা হইল যে দল ক্ষমতায় থাকিবে বা ক্ষমতায় আসিবে বলিয়া মানুষের ধারণা হইবে—সেই দলকেই আগামীদিনে সুযোগ সুবিধার আশায় কিছু মানুষ অর্থ দিয়াছেন চিরকাল। বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে জয়লাভ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই দলও নানা কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় তো রাজনৈতিক দলের একটি অপরিহার্য এজেন্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হইলেও বা ব্যবসায়ীরা অনৈতিক উপায়ে দাম বাড়াইলেও রাজনৈতিক দলের কোনও কিছু ভূমিকা থাকে না। সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লইয়া অসন্তুষ্ট হইলেও রাজনৈতিক দলের নেতাদের কোনও হেলদোল দেখিতে পাওয়া যায় না। কালো টাকার এই রমরমা রোধ করিবার জন্য চাই যথোপযুক্ত নির্বাচনী সংস্কার।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

নিজেদের অযোগ্যতা ও কুশাসনের ফলে উদ্ভূত এক শোচনীয় অবস্থার দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী নিত্য-নূতন স্লোগান আবিষ্কার করেছেন। যেমন—'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ', 'সমাজতন্ত্র', 'সমবায় চাষ', 'স্টেট ট্রেডিং' ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তব্য এই যে, এ পর্যন্ত দেশে এই সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি বলেই আজ আমাদের এই অবস্থা। যে ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত ধরে বিশ্বের খাদ্য ভাণ্ডার বলে গণ্য হোত, সেখানে আজ ভয়ানক খাদ্য-সংকট এক দুরারোগ্য ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। এর জন্য খাদ্য-সমস্যা সমাধানে—এবম্বিধ পরিকল্পনাকারীদের মহৎ অক্ষমতাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈ কি! এখন এই ভয়ানক মূর্খতাপূর্ণ ও আনাড়ীপনাপ্রসূত ব্যর্থতার জবাবদিহি এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁরা সংযুক্ত সমবায় কৃষির অদ্ভুত দৈবগুণাবলীর কীর্তন করে চলেছেন— যেন ওই প্রথায় হঠাৎ আপনিই চারদিকে কৃষির ফলন বৃদ্ধি পাবে।

—আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ

নির্বাচনের পর হাঙ্গামার আশংকা

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ এরাজ্যে সকল দলের শেষ পর্বের নির্বাচনী প্রচার চলছে। তবে শেষ প্রহরে নানা হাঙ্গামা হবে বলে আশংকা। সম্প্রতি সিপিএম সমর্থিত কলকাতার বেলঘাটার একটা ক্লাবে পুলিশ হানা দিয়ে মজুত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। ২৫টি তাজা বোমা, ৬০টি কার্তুজসহ কিছু রিভলভার পাওয়া গেছে। শুধু কলকাতাতেই নয়, জেলায় জেলায় বেশকিছু গোপন ঘাঁটিতে অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর। রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন এই ঘটনায় রাজনৈতিক হিংসা কবলিত রাজ্যের একটি খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে বলে মনে করেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার আর কে পচনন্দাও এই বিষয়ে সচেতন। তাঁরই নির্দেশে বেলেঘাটার ক্লাবটিতে হানা দেয় পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ ৩২০০ জনকে গ্রেফতার করেছে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত এদের গ্রেফতার করে রাখা হবে বলে জানা যাচ্ছে। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, রাজ্যের যুযুধান দুই দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে যেসব মাফিয়ারা রয়েছে, এরাজ্যে পরিবর্তন হলে তাদের মধ্যে শাসক দলের মাফিয়ারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বড় ধরনের ঝামেলা বাধাতে পারে।

সিপিএম-নেতাদের মধ্যে মুখ্য বক্তা হলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু ও আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কার্যত নিজের এলাকায় আটকে গেছেন। প্রথমদিকে তাঁর

আর কে পচনন্দা

এম কে নারায়ণন

বক্তৃতা ছিল প্যান প্যান-এ। পরের দিকের বক্তৃতায় আবার সেই ঔদ্ধত্য-দম্ভোক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে—''দেখি কে আমাদের বাধা দেয়?'' আবার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় সিঙ্গুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—''যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এমনটা আর হবে না।'' বুদ্ধবাবুর বক্তৃতায় আবার বামফ্রন্ট ফিরে আসছে—এ সম্পর্কে জোরালো কথা শোনা যাচ্ছে না। বুদ্ধবাবু কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়ে গেছেন।

শুধু বুদ্ধবাবু নন, তাঁর মন্ত্রিসভার অন্তত দশজন মন্ত্রী কঠিন লড়াইয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গৌতম দেব, অসীম দাশগুপ্ত, নিরুপম সেন, কিরণময় নন্দ। নিরুপম সেনের আবার পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক। গৌতম দেব যতই বক্তৃতায় হাঁকডাক করুন না কেন, তিনিও একইভাবে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছেন।

গৌতম দেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে—''এখন অবস্থাটা সমান-সমান।'' গৌতম দেব তাঁর বক্তৃতায় বার বার তৃণমূল নেত্রীর দু'টি হেলিকপ্টার ভাড়া সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিন কোটি টাকায় এই দু'টি কপ্টার ভাড়া করা হয়েছে। বিমান বসু'র বক্তৃতা প্রধানত আক্রমণাত্মক। তিনি বামফ্রন্ট সরকারের 'ত্রুটি' এবং 'সাফল্য' তুলে ধরছেন।

সব মিলিয়ে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বামফ্রন্টের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাদের নেতাদের কেউই নিশ্চিত নয়। কারণ সিপিএম-বিরোধী মনোভাব তীব্র। এখনও জনগণ সিপিএম-কে ক্ষমার চোখে দেখছেন না। এরাজ্যে সিপিএম লজ্জার মাথা খেয়ে বহিষ্কৃত প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চ্যাটার্জিকে দিয়ে বক্তৃতা করাচ্ছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকেও বক্তা করা হয়েছে।

অন্যদিকে তৃণমূলের নেত্রী সাম্প্রতিক বক্তৃতায় খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি অধীর চৌধুরীকে সম্বোধন করে বলেছেন ''পার্টির সঙ্গে পার্টির সমঝোতা হয়েছে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়। যাঁরা

এরাজ্যে শক্তি বৃদ্ধির আশংকাতেই বিজেপি-র নিন্দা ঃ জেটলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ''পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতাপার্টি সর্বশক্তি দিয়ে যে নির্বাচন লড়ছে তার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক বৃদ্ধি এবং 'সাপোর্টবেস' বা গণভিত্তিকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া।'' গত ২২ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বামফ্রন্ট একটানা ক্ষমতায় থাকার জন্য এখানে যে সার্বিক উন্নয়ন ও প্রগতি আশা করা হয়েছিল, তা হয়নি। পাঁচবছরে নীতিশ কুমার বিহারে এবং দশবছরে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে তা করে দেখিয়েছেন। সুতরাং পরিবর্তন করতেই হবে। এনিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইউ পি এ সরকারকে ভারত ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভ্রষ্টাচারীদের মদতদাতা বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষ আজ তিতিবিরক্ত হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ভ্রষ্টাচারের মোকাবিলার জন্য রাস্তায় নেমেছে।

অরুণ জেটলি

আর তখনই কংগ্রেস তথা ইউ পি এ সরকার ভ্রষ্টাচারকে চাপা দিয়ে (interdict) ম্যানেজ করতে চাইছে। এই সরকার দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি আটকাতে ব্যর্থ। মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের অন্যতম শরিক। তারা এখানে জোট গঠন করে নির্বাচন লড়ছে। শ্রী জেটলি আরও বলেন, মমতা ব্যানার্জী বিজেপি নিয়ে অনেক মন্তব্য করছেন, প্রথম প্রথম তাঁরা আমল দেননি। তবে এখন মনে হচ্ছে বিজেপি-র শক্তিবৃদ্ধিতে তিনি আশঙ্কিত। যদিও বিজেপি এখানে 'তৃতীয় দল'। তাঁর আরও বক্তব্য, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে সব থেকে বড় ধাক্কা খাবে কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক প্রশ্নের উত্তরে অরুণ জেটলি বলেন, তাঁরা কারও জয় বা পরাজয়ের জন্য লড়ছেন না। বিজেপি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ভোট ও গণভিত্তি প্রসারিত করতেই নির্বাচনে নেমেছে। তৃণমূল-মাওবাদী যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শ্রী জেটলি বলেন, কোথাও মাওবাদীরা বলছে, একটি দল ছাড়া অন্যদেরকে প্রচার করতে দেবে না। বাঘের পিঠে চড়া আর মাওবাদীদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা— দুই-ই সমান।

এটা মানতে চাইবেন না তারা বেরিয়ে যাক। নির্দলরা জিতলেও তাঁদের নেওয়া হবে না—এটাই তৃণমূলের সিদ্ধান্ত।"

এবার রাহুল গান্ধীর বক্তৃতায় কেবলমাত্র ভোট দেবার কথা ছিল। কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং যতই তোল্লা দিক না কেন, রাহুলের বক্তৃতায় কোনও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। একইভাবে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, হিন্দুস্থান এগিয়েছে --- পশ্চিবঙ্গ পিছিয়েছে। কেন্দ্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি সম্পর্কে, দার্জিলিং সম্পর্কে কোনও শব্দ তিনি উচ্চারণ করেননি। কারণটা বোধহয় বিমল গুরুং-রা সোনিয়ার সভায় ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছিল দলীয় পতাকা নিয়ে। এর বিরূপ ফল সমতলে দেখা যেতে পারে।

গোমাংস মিশ্রিত চীনা পিজ্জাও ভারতের বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে সস্তার চীনা ভোগ্যপণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গোমাংস মিশ্রিত ফাস্ট ফুড পিজ্জা (PIZZA)। এই চীনা পিজ্জার বাইরের মোড়কটা ইন্দোনেশিয়ায় তৈরি পিজ্জার মতোই। বাইরে মুদ্রিত ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে—'বীফ্ হিলেটিন' হালাল (আড়াই পোঁচে কাটা)। একথা ছাপার অর্থই হলো, ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যাতে নির্দ্বিধায় পিজ্জা কিনতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, কোরানে কেবলমাত্র হালাল মাংসই মুসলমানদের জন্য গ্রহণীয় বলা হয়েছে। মীরাটের জনৈক অজয় মিত্তল ইন্দোনেশিয়ান পিজ্জার মতো দেখতে 'গম্মী পিজ্জা' বাজার থেকে কিনে ২২ গ্রাম ওজনের পাঁচটি টুকরো পেয়েছেন। এর খুচরো দাম ১৫ টাকা। ১৫ গ্রাম ওজনের ইন্দোনেশিয়ান পিজ্জার দাম ছিল দশ টাকা। চীনা পিজ্জার নির্মাতার স্থানে 'মির্জা মজিদ জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানীর জন্য নির্মিত'—মুদ্রিত রয়েছে। ওই মোড়কের তৈরির তারিখ ৫ মে, ২০১০ এবং ব্যবহারের সময়সীমা ৪ মে ২০১১ ছাপা আছে।

এর মধ্যে আরও এক 'চমৎকার' ঘটেছে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় ইন্দোনেশিয়ান পিজ্জা বিষয়ক সংবাদ ছাপার পরে বাজার থেকে গোমাংসযুক্ত ইন্দোনেশিয়ান পিজ্জা ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে গেছে। হয়তো বিক্রেতারাই বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে থাকবে। মীরাট থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ রাজেন্দ্র আগরওয়াল সংসদের বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে গত ২৫ মার্চ জিরো আওয়ারে গোমাংস মিশ্রিত পিজ্জা নিয়ে সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে প্রশাসন এবং বিক্রেতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ-এর পক্ষ থেকে মীরাটে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নিতে আবেদন জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সরকারের আমদানী-রপ্তানী নির্দেশালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে গোমাংস (যে কোনও অবস্থায়) অথবা গোমাংস মিশ্রিত পণ্য আমদানী সম্পূর্ণ বেআইনী।

বেস্ট বেকারি মামলা
প্রধান সাক্ষীকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করেছে তিস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুম্বাইয়ে ট্রায়াল কোর্টে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য বেস্ট বেকারি মামলার প্রধান সাক্ষীকে 'কাজে লাগানো' (ম্যানিপুলেটেড) ও বাধ্য করা হয়েছে বলে সম্প্রতি এক চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত ২০১০-এর ১৭ জুন মুম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো এক হলফনামায় শেখ ইয়াসমিন তাঁকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বাধ্য করানো হয়েছে বলে এই অভিযোগ করেছেন। গুজরাটের বেস্ট বেকারির অগ্নিদাহের ঘটনাতেই ইয়াসমিন বানুর শ্বশুর নিহত হয়েছিলেন। শ্রীমতী বানুর অভিযোগের তীর স্বনিযুক্ত ও পবিত্র মানবাধিকার রক্ষায় সতত ব্রতী বলে প্রচারিত তিস্তা শীতলাবাদের দিকেই ছোড়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০২ সালে

ইয়াসমিন

তিস্তা শীতলাবাদ

গোধরাতে ট্রেনে করসেবকদের পুড়িয়ে মারার প্রতিক্রিয়ায় বেস্ট বেকারিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার যে ঘটনা ঘটে, তাকেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগিয়েছেন শ্রীমতী শীতলাবাদ। এই ঘটনাকে সামনে রেখে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও গুজরাট সরকারকে হেয় করা এবং সেইসঙ্গে হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, ইয়াসমিনের অভিযোগ প্রকাশ হয়ে পড়ায় শীতলাবাদ যে আদালতকেও উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন, সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। লক্ষণীয় বিষয়, প্রায় একবছর আগে ইয়াসমিন তার হলফনামা পেশ এবং তা দেশের প্রধান বিচারপতি ও ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশনের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষ পদাধিকারীদের জানালেও শীতলাবাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মানবাধিকারের নামে এই দেশবিরোধী চক্র শাস্তির হাত থেকে এড়িয়ে যায় কিনা সেটাই এখন দেখার।

মিথ্যাচার, কেচ্ছা, কুৎসা রটনা কমিউনিস্ট কালচার

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দফা ভোটের লড়াই শেষে যোদ্ধারা বাকি তিন দফার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। লড়াই আধাআধি হয়েছে। অনেকটা ফুটবল খেলার মতোই। হাফটাইমের সাময়িক বিরতি। রেফারির বাঁশি বাজলেই খেলোয়াড়রা দলের জার্সি পরে মাঠে নেমে পড়বেন। তফাৎ শুধু ফুটবলের খেলায় দর্শকরা জানতে পারেন কোন দল এগিয়ে আছে বা কোন দল পিছিয়ে পড়েছে। কোন দল ভাল খেলছে বা খারাপ খেলছে। ভোটের লড়াইতে তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। যেমন, তিন দফার বিধানসভার ভোটে এবার রেকর্ড ভোট পড়েছে। গড়ে ৮৪ শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের রায় ইতিমধ্যেই বোতাম টিপে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কী জানিয়েছেন তা কেউই জানে না। জনগণের রায় ভোটযন্ত্রে গোপন বন্দী হয়ে আছে। জানা যাবে ১৩ মে। জানা নেই বলেই তিন দফার ভোট শেষে যুযুধান নেতা নেত্রী কর্মী সমর্থকরা সকলেই বলছেন জনতার রায় আমাদের পক্ষেই পড়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ভোটপর্বের তিন দফা শান্তিতে কেটেছে।

হাফ টাইমের বিরতিতে প্রথমার্ধের তিন দফায় লড়াই কেমন হয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে হয় যে ভোট প্রচারে বামজোট এবং বাম বিরোধী প্রধান জোট শরিকের হেভিওয়েট নেতা নেত্রীরা রাজনৈতিক বক্তব্যকে দূরে সরিয়ে রেখে ব্যক্তি-কুৎসাকেই হাতিয়ার করেছেন। কুৎসা রটনা, মিথ্যাচার ইত্যাদি চিরকালই বাঙালি বামপন্থীদের প্রচারের প্রধান এবং সম্ভবত একমাত্র হাতিয়ার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায় সকলেরই বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য, আর্থিক দুর্নীতির কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে একদা বাহবা কুড়িয়েছেন বাংলার বামপন্থীরা। মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বভাবগত কারণে কেচ্ছা, কুৎসা শুনতে ভালবাসে। অনেক সময় বিশ্বাসও করে। পরচর্চা পরনিন্দা মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্যতম বিনোদন। তাই সিপিএম নেতা অনিল বসু প্রকাশ্য জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘‘সোনাগাছির মেয়েছেলে’’ বললে বা ‘‘খেমটাওয়ালির খেমটা নাচ’’ দেখতেই লোকে তৃণমূলের সভায় ভিড় করে বলে কোমর দুলিয়ে বিদ্রুপ করলে বাঙালি কম্যুনিস্টরা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। তাঁরা নবরসের মধ্যে আদি রসটিকেই বেশি পছন্দ করেন। তাই একদা তাঁরা কংগ্রেস নেত্রী মায়া ব্যানার্জী বা আভা মাইতির সম্পর্কে কদর্য আদিরসাত্মক মন্তব্য করতেন। এখন সেটাই অনিল বসু, বিনয় কোঙাররা ভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রীর সম্পর্কে করছেন। এটাই পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট কালচার। পার্থক্য শুধু মায়া ব্যানার্জী আভা মাইতিদের সময় নির্বাচন কমিশন, মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের বা সংবাদমাধ্যমের এতটা ক্ষমতা, রমরমা বা প্রভাব ছিল না। তখন কুৎসিৎ কদর্য ইঙ্গিত করে পার পাওয়া যেত। এখন যায় না। তাই অতীতে ব্যক্তি-কুৎসা প্রচারের জন্য কম্যুনিস্টরা কোনওদিনই ক্ষমা চায়নি। এখন অনিল বসুদের চাইতে হচ্ছে।

একদা তাঁরা কংগ্রেস নেত্রী মায়া ব্যানার্জী বা আভা মাইতির সম্পর্কে কদর্য আদিরসাত্মক মন্তব্য করতেন। এখন সেটাই অনিল বসু, বিনয় কোঙাররা ভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রীর সম্পর্কে করছেন। এটাই পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট কালচার।

গূঢ়পুরুষের কলম

ভোট পর্বের হাফটাইমে দ্বিতীয় যে বিষয়টি চোখে পড়েছে তা হচ্ছে ভোটদাতাদের দৃঢ়তা। তাঁদের নৈঃশব্দ। শত প্ররোচনাতেও ভোটদাতারা বুথের সামনে লাইন থেকে সরেননি। কোনও দলেরই নেতা, মাস্তানদের বুথের সামনে দাঁড়িয়ে খবরদারি করতে দেননি। কাঠফাটা রোদে লাইনে দাঁড়ানো মানুষই পুলিশের ভূমিকা পালন করেছেন। যে নজরদারি অতীতে দলদাস পুলিশ করেনি এবার সেই কাজটি সাধারণ মানুষ রিগিং রুখতে স্বেচ্ছায় করেছেন। আর ঠিক এই কারণেই বাম বা বামবিরোধী শিবির থেকে এই প্রথম ব্যাপক রিগিং, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদির অভিযোগ তেমন শোনা যায়নি। উভয়পক্ষই মেনেছে যে ভোট ভাল হয়েছে। মানুষ নিজের ভোট নিজে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজত্বে এমন অবিশ্বাস্য কথা এর আগে কেউ শুনেছে কি? সত্যিই এটি রাজ্যের তিন দশকের নির্বাচনী ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। আর ঠিক এখানেই জনতার রায়ের গোপন কথাটির চাবিকাঠিটা লুকিয়ে আছে। অতীতে সিপিএম সন্ত্রাস ছড়িয়ে রিগিং করে ভোটে জিতেছে। মানুষকে নিজের ভোট দিতে দেয়নি। এমন অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষবার করেছেন। এবারে প্রথম তিন দফায় সন্ত্রাস মুক্ত, রিগিং মুক্ত, অবাধ ভোট হয়েছে বলে মমতা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ভরাডুবি হওয়ার কথা। যদি তাই হয় তবে প্রমাণিত হবে এতকাল ভোটে, সিপিএম রিগিং করেই জিতেছে। বামফ্রন্টের পিছনে জনসমর্থন ছিল না।

তৃতীয় বিষয়টিও চোখে পড়ার মতোই। ভোটের আগে আশঙ্কা ছিল যে ক্ষমতা ধরে রাখতে শাসকদল হিংসা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে পারে। লালগড়, মঙ্গলকোট এবং নেতাইকাণ্ডের পর এমন আশঙ্কাকে সত্য বলেই মনে হয়েছিল। একমাত্র এই কারণেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ছয় দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এত দীর্ঘদিন ধরে ভারতের দ্বিতীয় কোনও রাজ্যে ভোটপর্ব চলেনি। হিংসাদীর্ণ, অশান্ত বাংলায় গত তিন দফার ভোট কিন্তু সব আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে মোটামুটিভাবে শান্তিতেই হয়েছে। কীভাবে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কে বলবে? নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপ অথবা শান্তি বজায় রাখতে সাধারণ মানুষের এককাট্টা হওয়া—কাকে আগে রাখবো? তবে শান্তিতে ভোট হওয়ায় কিছু কিছু বাম নেতা ক্ষুব্ধ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানো জনৈক প্রভাবশালী ডাকাবুকো সি পি এম মন্ত্রীতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ১৩ মে ভোটের ফল প্রকাশের রাত্রে গ্রামে গ্রামে রক্তগঙ্গা বইবে। এমন কথার অর্থ, হিংসা সন্ত্রাসে ইন্ধন যোগানো। সিপিএম মন্ত্রীর বোঝা উচিত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকীতে মানুষ এখন আর ভয় পায় না। সিপিএমের হার্মাদদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে গ্রামের মানুষ জানে রক্তগঙ্গা কীভাবে রোধ করতে হয়। সিপিএম যে কতটা ক্ষমতালোভী তা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনিল বসু, গৌতম দেব এবং রেজ্জাক মোল্লাদের কথাবার্তা, আচরণে। নির্বাচনে ক্ষমতার বদল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সিপিএম দলের আচরণে মনে হচ্ছে ক্ষমতা হারালে তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই সর্বহারা হবেন।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম মরিয়া হয়ে আবোল-তাবোল বকছে

নিশাকর সোম

প্রথম দফার নির্বাচন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে নির্বাচন সমাপ্ত হলো। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা হলো বেশি (!) সংখ্যায় ভোট পড়েছে। অতএব তৃণমূল সমস্ত আসনেই জিতে যাচ্ছে! একটা কথা পরিষ্কার জানা দরকার যে বিগত লোকসভা এবং তার আগের বিধানসভা নির্বাচনে যে শতকরা ভোট উত্তরবঙ্গে পড়েছিল, সেটাই মোটামুটি বজায় আছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একটা পার্সেন্টেজ ভোট বেশি পড়েছে, তাহলে এটাও বোঝার দরকার যে সমগ্র উত্তরবঙ্গে নতুন ভোটার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। সেই অনুপাতে তো ভোট পড়ে নি। আনুপাতিক হারে অর্থাৎ নতুন ভোটারদের ধরলে ভোট কম পড়েছে। আমাদের প্রায় সবকটি দৈনিক পত্রিকার সংবাদ প্রচারে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো এই সংবাদগুলিতে আগেই সাবজেকটিভ অর্থাৎ মনের মতো সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঘটনার বিন্যাস করা। তা না হলে উত্তরবঙ্গে যে বিজেপি একটা স্থান অধিকার করে আছে সে সম্পর্কে নীরব কেন দৈনিকগুলি? এটা বলা যায় যে মালদহসহ কয়েকটি জেলায় বিজেপি যথেষ্ট দৃঢ় অবস্থান রাখবেই। তাইতো মালদহের জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, ''বিজেপি সিপিএম-এর দালাল, সিপিএম- বিজেপি এক। বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছে।''

অথচ নেত্রী কিন্তু মুসলিম ধর্মের মোনাযাত, দোয়া, নমাজ করা এবং রোজা রাখা ও মুসলিম নারীদের মতো পোশাক পরে মুসলিম অঞ্চলে ভোটের প্রচারে যান। তাই অল ইন্ডিয়া ইমাম সংগঠন প্রেস কনফারেন্স করে মমতাকে সমর্থন জানিয়েছেন! উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে বলা যায় বিজেপি-র যেমন ২/১টি কেন্দ্রে জেতার সম্ভাবনা আছে, তেমনি কংগ্রেস-এরও সিট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় তৃণমূল এবং সিপিএম-এর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

এদিকে গৌতম দেব কালো টাকা নিয়ে সোরগোল তুলেছেন। এ বিষয়ে সোনিয়া গান্ধী চুপচাপ থেকেছেন। এমনকী গোঁজ প্রার্থীদের বিরুদ্ধেও সোনিয়া গান্ধী কিছুই বলেননি। উপরন্তু মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরী সোনিয়াকে বুদ্ধমূর্তির এক স্মারক দিয়ে প্রণাম করেছেন এবং প্রণব মুখার্জির কথাতেই মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসে অনৈক্য হয়েছে বলেছেন। প্রণববাবুর রাজনীতি কি শেষ হতে চলেছে? সিপিএম-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-ক্রোধ এখনও বজায় আছে। তাইতো বিমান বসু ও গৌতম দেব আবোল তাবোল বলে চলেছেন। বস্তুত দুই যুযুধান শিবির কোনও ইতিবাচক প্রচার করছে না। কেবল একে অপরে বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেও সিপিএম-এর সাংগঠনিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাই বহিষ্কৃত সোমনাথ চ্যাটার্জি এবং দূরে সরে যাওয়া রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র-কে প্রচারে নামানো হয়েছে। একদা বহিষ্কৃত নেপাল দেব প্রার্থী হয়েছেন—ফিরে এসেছেন অলোক মজুমদার।

এদিকে সিপিএম-এর সাংগঠনিক অবস্থা এখনও অর্ধমৃত। উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, কলকাতাতে শোচনীয় অবস্থা। কলকাতাতে কসবা, বালিগঞ্জ, এন্টালী কেন্দ্রে সিপিএম-এর সংগঠন স্থবির। আগেই হেরে বসে আছে। এন্টালীতে তো একটি বস্তি প্রোমোটারের হাতে তুলে দেওয়াতে সেখানকার বস্তিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৪০০ ভোটার বিরুদ্ধে চলে গেছে।

এন্টালীতে এক নির্বাচনী জনসভায় ৫০ জনের বেশি লোক ছিলেন না। সেখানে মন্ত্রী দেবেশ দাশ বস্তুত পরাজয়ের মুখে।

কলকাতায় বালিগঞ্জ কেন্দ্রে প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন বিধায়ক তথা একদা সিদ্ধার্থশঙ্কর-এর মন্ত্রিসভার সদস্য, যাঁকে মমতা তরমুজ বলতেন, সেই সুব্রত মুখার্জি-কে সিপিএম কার্যত 'ওয়াকওভার' দিয়েছে। যেহেতু সিপিএম-এর কলকাতা নেতৃত্ব বিদায়ী স্পিকার হালিমকে পছন্দ করেন না তাই তাঁর পুত্র ডঃ ফুয়াদ হালিম-কে যূপকাষ্ঠে শুইয়ে দিয়েছে। কোনও কর্মী তাঁকে সাহায্য করছেন না। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী জায়াকে নিয়ে ফুয়াদ বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন।

ঠিক একই অবস্থা কসবা কেন্দ্রের। সেখানে সিপিএম-কর্মীদের অপছন্দের প্রার্থী শতরূপ। এ-কেন্দ্রে লোকাল পার্টি জনৈক কাউন্সিলারকে চেয়েছিল এবং লোকাল পার্টি চাইছে না যে এই এলাকায় রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব মাথা গলাক। এমনকী পরাজিত কাউন্সিলার জনৈকা গুহঠাকুরতার ওয়ার্ডে একজন কর্মীও নির্বাচনী কাজ করছেন না, নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। কার্যত সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটি ব্যর্থ। এমনকী বেলেঘাটাতেও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি।

এছাড়া জোড়াসাঁকোতে বিজেপি প্রার্থী মীনা পুরোহিতের অবস্থা মোটের উপর ভাল। কারণ স্মিতা বক্সী-কে স্থানীয় কংগ্রেসীরা চান না। তাঁরা চুপচাপ পদ্মফুলে দেবেন ছাপ। বিজেপি এখানে লস্ট 'কেস' নয়।

তৃণমূল বিপুল সাড়া ফেলে কলকাতায় কাজ করছে। মমতা ব্যানার্জি তো কলকাতায় সভা করছেন। কলকাতায় সিপিএম ঠেকে যাবে। উত্তর ২৪ পরগনায় গৌতম দেব-কে অমিতাভ নন্দীর গোষ্ঠী সাহায্য করছেন না। এছাড়া বিমান বসু গৌতম দেব-কে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তিনিও কি গৌতম-এর উত্থানে বিব্রত-বিরক্ত? মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু এখন নিজের কৃতকর্মের পাপ-স্খালনে ব্যস্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিপিএম জেলা কমিটি তো ফেডারেশন অর্থাৎ সকল প্রার্থীরাই নিজ নিজ কেন্দ্রে জেলা-কমিটি গড়ে তুলেছেন। জেলা-সম্পাদক সুজন চক্রবর্তীকে কেউই আমল দেয় না। বীরভূমে তো নানুরের ঘটনা মানুষ ভুলে যান্‌নি। এখানকার সিপিএম জেলা-কমিটি নিমজ্জমান অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সোমনাথ চ্যাটার্জি সহ শান্তিনিকেতন-এর কয়েকজন সদস্যদের স্বাক্ষরিত প্রচারপত্র বিলি করে ভাসার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় দফার প্রচারের পর অবস্থার যে খুব একটা হেরফের হবে তা নয়। কারণ এখনও সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন না এবং অনেকেই চান না অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার ফিরে আসুক।

পাঠকগণ এই কলামে চোখা চোখা কথা না বলতে পারার জন্য মার্জনা করবেন। এই কলামে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস করা হলো।

এই সময়

চন্দ্রাভিযানের সাক্ষী

আগামী ২০১৬ সালে নাসার চন্দ্র অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হতে চলেছে ভারত। চাঁদের স্বল্প আবিষ্কৃত অংশটি ছাড়াও বাকি অন্যান্য অংশে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেশ রিসার্চ অর্গানাইজেশন) গাটছড়া বেঁধেছে আমেরিকার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরীর সঙ্গে। সুতরাং চাঁদ-মামার আরও অজানা দিক আবিষ্কারের জন্য ২০১৬-এর দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকবেন ভারতবাসী। এবং সেই পরবর্তী আবিষ্কারের ভাগীদার হওয়ার স্বপ্নও যে তাঁরা ইতিমধ্যেই দেখতে শুরু করে দিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

ঠেকেও শেখে না

কথাতেই আছে—কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু ভারত সরকার যে কী টাইপের তা বোধহয় 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্য!' গোয়েন্দা সূত্রের খবর—নিউক্লিয়ার পদার্থবাহী ক্ষুদ্র-রেঞ্জের Hatf-৯ মিসাইল, পাকিস্তান সরাসরি তাক করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দিকে। গোয়েন্দা সূত্র যখন ইসলামাবাদের গতি-প্রকৃতি উদ্ধৃত করে এই তথ্য দিচ্ছে তখন পাক-বাণিজ্য সচিব জাফর মেহমুদ গত ২০ এপ্রিল ইসলামাবাদে বসেই মন্তব্য করছেন— 'যখন পাকিস্তান বিদ্যুতের অভাবে ভুগছে, তখন ভারত তার প্রতিবেশীকে বিদ্যুতের অনটন থেকে রক্ষা করতে কম দামে বিদ্যুৎ আমাদের দিতে চাইছে।' বাহ্! এই না হলে দেশের সরকার। কেউ কেউ ব্যঙ্গও করছেন— 'গিন্নী খেতে পান না নিজে, শঙ্করাকে ডাকে।' এই শঙ্করা আবার গিন্নীর পাতে বিষ মেশাতেও ওস্তাদ।

পথ-দুর্ঘটনা

প্রতিবছর পথ দুর্ঘটনায় ভারতে মৃত্যু হচ্ছে অন্তত ১ লক্ষ মানুষের। যেটা সন্ত্রাসবাদী হানায় মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে অন্তত ২০ গুণ বেশি। গত ২০ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোপালকৃষ্ণ পিল্লাই। কার্যকরী পথ-নিয়ন্ত্রণ (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট)-এর জন্য সরকার এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন তিনি।

সিদ্ধান্তহীনতা

ঘটা করে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারত-পাক ম্যাচে পাক-কূটনীতিবিদদের সাদর আমন্ত্রণ ও সেই ম্যাচের অব্যবহিত পরে পাক অধিনায়ক সৈয়দ আফ্রিদির 'ভারতীয়রা উদার নয়' মার্কা মন্তব্যে বেজায় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কেন্দ্রীয় সরকার। 'ক্রিকেটীয় কূটনীতি' আর 'আবেদন-নিবেদনে'র কংগ্রেসী রাজনীতি দেশের আখেরে কতটা ক্ষতি করবে সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু একথা কেন্দ্রেরই একটা তরফ বলেছিল যে, সব ঝুটঝামেলা মিটিয়ে আগামী বছরের গোড়াতেই ভারতীয় ক্রিকেট দল পাক-সফরে যাচ্ছে। যদিও গত ২০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিদেশ-সচিব নিরুপমা রাও স্পষ্টই জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে 'ক্রিকেট-টাই' পুনরায় আরম্ভ করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি কেন্দ্র।

দুর্নীতি চলছে, চলবেই

খবরদার মশাই! সবকিছু সহ্য করতে রাজি আছি। খালি দুর্নীতি নিয়ে কোনও খোঁটা বরদাস্ত করবো না। দুর্নীতি করি বলে কি আর মানুষ, থুড়ি সরকারী আমলা নই! দুর্নীতি আমাদের জন্মগত অধিকার এবং আমরা তা অর্জন করবই। মনোভাবটা অনেকটা এরকমই দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের সরকারি আমলাদের। দেশের মন্ত্রীদের ছোঁয়াচ বোধহয় লেগেছে তাঁদের। রাজ্য সরকারের পার্সোনেল এবং প্রশিক্ষণ দপ্তর দুর্নীতি রোধে রাজ্যের ৫২৩ জন আই এ এস আধিকারিককে তাদের সম্পত্তির খতিয়ান পেশ করতে বললেও, পেশ করার শেষদিন পেরিয়ে যাবার পরে দেখা গেল ৫২৩ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জন আই এ এস আধিকারিক তাঁদের সম্পত্তির খতিয়ান পেশ করেছেন। বাকি ৫১৭ জনের সম্পত্তির কোনও পাত্তা নেই। কু-লোকে বলছে, স্বাভাবিক; কেঁচো খুঁড়তে না কেউটে বেরোয়!

কাস্ত্রোর পদত্যাগ

কমিউনিস্টদের সময়টা এখন নেহাতই মন্দ। বঙ্গে পরিবর্তনের গুঁতো, সেইসঙ্গে হাভানায় দুঃসংবাদ যে কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। সম্প্রতি সেদেশের কাগজ কিউবাডিবেটে একটি লেখায় ৮৪ বছরের কাস্ত্রো এহেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ তাঁরা দেহত্যাগ করেন, পদত্যাগ করেন না। বঙ্গজ কমিউনিস্টদের দেখলেই সেটা মালুম হয়। তবে কাস্ত্রো বোধহয় এই আপ্তবাক্যের ব্যতিক্রম নন। দুর্জনেরা বলছেন, ডালমে কুছ কালা হ্যায়। নইলে কমিউনিস্টধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে কাস্ত্রো কখনও পদত্যাগ করেন! যতদূর জানা যাচ্ছে, পার্টির আর্থিক সংস্কারমুখী চিন্তা-ভাবনাই কাস্ত্রোকে নেতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করিয়েছে।

স্নো-লেপার্ড

ইয়েতি কিংবা বরফ-মানুষ আছে না নেই—এনিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। তবে ইয়েতি-র অস্তিত্ব নিয়ে যতই সন্দিহান হোন, স্নো-লেপার্ড (বরফ-চিতা) কিন্তু প্রথমবারের জন্য ধরা দিল ক্যামেরায়। উত্তরাখণ্ড সরকারের বন-দপ্তর এবং ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি চামেলি জেলায় বিরলতম এই প্রাণীটিকে ক্যামেরাবন্দী করেছেন। উচ্চ হিমালয়ের মাত্র পাঁচটি দেশে অস্তিত্ববাহী এই প্রাণীটির সংখ্যা শ' পাঁচেকের বেশি নয়। প্রাণীটির অস্তিত্ব নিয়ে বিশেষ সংশয় না থাকলেও এই 'ফ্ল্যাগশিপ' প্রাণীটিকে ইদানীংকালে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একথা অনস্বীকার্য যে, ইয়েতি-র মতোই রূপকথা হয়ে যাওয়া থেকে স্নো-লেপার্ডকে তাই বাঁচিয়ে দিল দেরাদুনের ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট।

বাংলার খাস তালুকে বিপর্যয় সিপিএমের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১ মার্চ সরকারীভাবে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এ-রাজ্যে এক টানটান উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাস্তবে ৬ দফা নির্বাচনের পর্ব যতই শেষের দিকে যাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে উত্তেজনার পারদ চড়ার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে নিত্যই খুন, জখম, অগ্নিসংযোগ, এলাকা দখলের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। রাজ্যের অচলায়তন যে পতনের মুখোমুখি হয়েছে সে সন্দেহ ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। অথচ ৩৪ বছরের প্রথম একটি দশক বাদ দিলে প্রায় ২৪ বছরের নিকম্মা দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরন্তর অপচেষ্টার এই স্বাভাবিক পরিণতি মেনে নিতে শাসক দল রাজী নয়। সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে একটি চিত্তাকর্ষক সংবাদে প্রকাশ কাজাখস্তানের সুলতান আবিকুলি নজরবায়েভও ২০ বছর মসনদে বসে থাকলেও ওষুধপত্র খেয়ে বয়স কমিয়ে আরও বহুদিন থেকে যেতে অভিলাষী। এ বাবদ তিনি গবেষকদের পেছনে দেদার খরচাও করছেন। গত কয়েক মাসে আরব ও আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্রী শাসকেরা কেউ ক্ষমতা হারিয়েছে, কেউ বা হিংসার ও ধ্বংসের মাধ্যমে কোনক্রমে টিঁকে আছে ও দিন গুণছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কম্যুনিস্ট চীন সাম্যবাদের মোড়কে চূড়ান্ত একদলীয় শাসন চালাতে অভ্যস্ত হওয়ায়— স্বভাবতই ভেতরে ভেতরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর আঁচ তাদের সুপ্ত জনগণের ঘুম ভাঙাতে পারে। এ খবর সারাদেশের সংবাদপত্রেই কমবেশি প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাসের এমন সন্ধিক্ষণেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল বিশ্বের এই সব স্বৈরতান্ত্রিক কুশীলবদের আচার আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করার মরীয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। নির্বাচন যুদ্ধে গণতন্ত্রে হার-জিত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রের মুখোশধারী একদলীয় শাসন প্রয়াসী সিপিএম দল হার মানতে রাজী নয়। অপশাসনের ইমারতের ধ্বংস তাদের কল্পনার অতীত। দিকে দিকে বিরোধী দলনেত্রীর পদযাত্রাগুলিতে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। তাদের মধ্যে কিছু একটা ঘটানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা শাসকদলকে একেবারে দিশেহারা করে দিয়েছে। ফলশ্রুতি রাজ্যবাসী প্রায় এক গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন। একথা অনস্বীকার্য শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সিপিএম বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সেই লোকসভা ২০০৯ থেকেই মানুষের মধ্যেকার ভয় ও নির্জীবতা অনেকাংশে দূর করে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের যে আব্যশিক শর্ত ভোট, যাকে কেন্দ্র করে এত সহস্র কোটি টাকার খরচ, সেই মানুষই যদি নির্ভয়ে ভোট দিতে না পারেন তা হলে সবই তো ভস্মে ঘি ঢালা। মমতা দেবীর চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে পুনরুত্থান ঘটেছে তাকে মান্যতা দিতেই হবে। তবে বহু কাগজপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বারবার একটি জরুরি বিষয় আলোচিত হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলটি আদ্যন্ত নেত্রীকেন্দ্রিক হওয়ায় সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক থেকে যায়। যা অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিকাশের সহায়ক নয়। একথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আজকের এই আপতকালে মানুষ ভবিষ্যতের

মানুষের সর্বগ্রাসী রোষানলে তাঁরা যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন তার আন্দাজ পেয়ে তাঁরা আজ পাগলপ্রায়, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। প্রতিদিন নির্মম থেকে নির্মমতর হয়ে উঠছেন। পোড়ামাটি নীতি নিয়ে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল দেনা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। হার্মাদদের অত্যাচার, গৃহদাহ, খুন আর মিথ্যে মামলার বন্যায় বাঙলার গ্রামাঞ্চল সন্ত্রস্ত, অসহায়।

সম্ভাবনা ভবিষ্যতের কাছেই গচ্ছিত রাখছে। Mathew Arnold এর সেই কথাটি না বললেই নয়—The old is dead. The new is yet to be born। মানুষ নবজন্মের শরিক হতে আজ বদ্ধপরিকর। দৃঢ়সংকল্প, দলীয় বিভীষিকার বাতাবরণ থেকে সে পরিত্রাণ পেতে বাধাবন্ধহীন। এখন প্রশ্ন জাগে—সিপিএম দলের এমন অসংলগ্ন আচরণের কারণ কি? শুধুই কি রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর আতঙ্ক? অবশ্যই সেটি মূল কারণ। ৩৪ বছর ধরে মন্ত্রীত্ব করতে করতে মন্ত্রীত্বের যে রিটায়ারমেন্ট হয় তা এঁরা ভুলেই বসে আছেন। গদী ধরে রাখতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় থেকেও অবলীলায় বলছেন, খুন-জখমের দায়ে অভিযুক্ত জামিনে ছাড়া পাওয়া মজিদ মাস্টারকে দিয়ে প্রচার করাবেন। নেতাই কাণ্ডে ফেরার আসামীরাও নির্বাচনের কাজে যোগ দিচ্ছেন—এমনটাও বলেছেন দাগী মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ। এদিকে গৌতম দেব (মহাভারতের উলুকের ঢঙে) নিত্য নতুন হুঙ্কার দিয়ে কুৎসিৎতম ব্যক্তি আক্রমণের নমুনা রাখছেন। দলীয় শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না করে দলের বহিস্কৃত সদস্যকেও ডেকে প্রচারে নামাচ্ছেন। এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। একথা ঠিক যে ২০০৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পর ৬১ জন বামপন্থী এম পি। দিল্লীর সরকার ''উঠতে বললে উঠছে বসতে বললে বসছে।'' এর পরেই ২০০৬ সালে রাজ্যে ছলে-বলে-কৌশলে ২৩৫ জনের সদর্প আস্ফালন। হায় কমরেড 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়'। নশ্বর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী ধরে নিয়ে মানুষের ওপর নির্যাতনের পরিণতি যে কী করুণ হতে চলেছে সবজান্তা কমরেডরা নিজেদের করা সমীক্ষাতেও তা টের পেয়েছেন। খবর পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের পুলিশের সর্বোচ্চ স্তরেও একটি ঢিলেঢালা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তার ফলাফলেও সরকারের জেতার আশা পাওয়া যায়নি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সম্ভাব্য পরাজয়ের অভিঘাত আরও তীব্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেরলে গরিষ্ঠতা পাওয়ার আশা ক্ষীণ হওয়ায় বাংলার খাস তালুকে এই বিপর্যয় পার্টির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে সন্দেহ নেই। দলের তাত্ত্বিক নেতাদের—সর্বজ্ঞ নীলোৎপলবাবু, সীতারামে অবিশ্বাসী ইয়েচুরি, আজীবন নির্বাচন অভিজ্ঞতাহীন কারাট দম্পতির বৃন্দগান, কারখানা লাটে তোলা সিটু সভাপতি শ্যামলবাবু ও সর্বোপরি লোকসভায় হারা, মেয়র হবার অতৃপ্ত বাসনায় তিক্ত রসনা আই এস আই এজেন্ট (সুব্রত মুখার্জী ঘোষিত) সহ সেলিমদের কোলে করে কে রাজ্যসভায় নিয়ে যাবে। হতভাগ্য বাঙ্গালী তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে রাজ্যে একদল অপরিণামদর্শী পরিকল্পনাহীন দলদাসকে বছর বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচিত করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরাই আবার ততোধিক অপদার্থ বাঙলার প্রতি দায়বদ্ধতাহীন রাজ্যসভার সদস্যদের মনোনীত করেছেন। সেই শোষণ পর্বের মুষল পর্ব সমাগত। একথা নির্বাচন লুট করায় একাধিক ডিগ্রীধারী কমরেডরা বুঝতে পেরেছেন। মানুষের সর্বগ্রাসী রোষানলে তাঁরা যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন তার আন্দাজ পেয়ে তাঁরা আজ পাগলপ্রায়, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। প্রতিদিন নির্মম থেকে নির্মমতর হয়ে উঠছেন। পোড়ামাটি নীতি নিয়ে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল দেনা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। হার্মাদদের অত্যাচার, গৃহদাহ, খুন আর মিথ্যে মামলার বন্যায় বাঙলার গ্রামাঞ্চল সন্ত্রস্ত, অসহায়। তাই এই নির্বাচন পর্ব যত তাড়াতাড়ি মেটে—সেটুকুই একমাত্র কাম্য। নইলে ভোট বাঙলার শবসাধনায় সিপিএম সর্বকালীন রেকর্ড করবেই করবে।

একটি দেশ— যেখানে কোনও নেতা নেই

অতিথি কলম

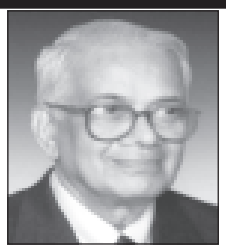

এম ভি কামাথ

আমরা কি তৃণমূলস্তর থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত? অথবা আমরা এটা ভেবে আশ্বস্ত হব যে, অন্যরা আমাদের যে ভাবনাচিন্তা করে তার থেকে কম দুর্নীতিগ্রস্ত। বৃটিশ ভারত দখলের পূর্বে বিশ্বজুড়ে আমরা খ্যাত ছিলাম এই বিষয়ে যে, আমাদের নৈতিক চরিত্র ছিল অতীব সুন্দর, কিন্তু গত কয়েক শতকে নৈতিক অধঃপাত একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে।

সম্প্রতি এক বৈশ্বিক সমীক্ষায় ঘটনাচক্রে জানা যায় যে, ৮৫ শতাংশ মোবাইল চোর অথবা ওয়ালেট চোর তাদের সংগৃহীত বস্তু মালিকদের কাছে ফেরৎ দিয়েছে। এই সততার দৃষ্টান্ত সত্যই অনবদ্য। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই অনবদ্য উপমা কেবল দেশের নিম্নবিত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও চুরি করার এই দৃষ্টান্ত যারা সমাজের উপরতলায় লোকজন—জীপ কেলেংকারি থেকে অতি সাম্প্রতিক ২-জি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত তারা এই সমাজে ধিক্কৃত।

যাঁরা অতীতে এইসব কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেছেন তাঁরা হলেন হরিদাস মুন্দ্রা, হর্ষদ মেহতা, সুখরাম, পুরানোকালের অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি, প্রাক্তন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী কে ডি মালব্য, সর্দার প্রতাপ সিং কৈরো, হরেকৃষ্ণ মহতাব, বক্সী গুলাম মহম্মদ, লালু যাদব, একেবারে অধুনা আন্দিমুথু রাজা, যাঁর সাকরেদ বাচা ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছে।

গত দশ বছরে আমরা শুনেছি এইচ ভি ডব্লু ডুবোজাহাজ কেলেঙ্কারিতে দেশের কোষাগারের ক্ষতি হয়েছিল ৩২.৫৫ কোটি টাকা, যা আজকের কেলেঙ্কারির তুলনায় একেবারে নগণ্য। ১৯৯০ সালে এয়ারবাস কেলেঙ্কারিতে ক্ষতি হয়েছে দেশের ১২০ কোটি টাকা। ১৯৯২-তে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে তছরূপের ঘটনায় ক্ষতি হলো ৭৬২.৯২ কোটি টাকা। সরকারকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে ২৬৭৫ কোটি টাকা খয়রাতি সাহায্য দিতে হলো। ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক পলিসি সেন্টার এক তথ্যে জানিয়েছে যে, ১৯৪৮ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত এদেশ থেকে বে-আইনিভাবে অর্ধ ট্রিলিয়ন টাকা পাচার হয়ে গেছে।

এই ধারায় একেবারে সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো হাসান আলি মামলা। যদি আলি মুখ খোলেন তবে আরও অনেকের নাম তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আমরা আর কতদিন এদের কেচ্ছা বয়ে চলব? ২০০৫ সালে 'এসোশিয়েন অব্ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস অ্যান্ড ন্যাশানাল ইলেকশন ওয়াচ' নামে একটি সংস্থা যা দেশের ১০০০ এন জি ও সংস্থার শীর্ষ সংস্থা—তারা জানিয়েছে যে, শুধুমাত্র বিহারেই ২৪৩ জন বিধায়কদের মধ্যে ১০৯ জন বিধায়কই অপরাধী। খবরে প্রকাশ ওদের মধ্যে ৬৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু হয়েছে। দলগত অপরাধীদের অবস্থান হলো এরকম ঃ ৩৯ জন বিধায়ক জনতা দল (ইউ), ৩২ জন বিজেপি এবং ১৯ জন বিধায়ক আর জে ডি-র। পঞ্চদশ লোকসভাতে ১৫০ জন এমন সাংসদ রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যার অভিযোগ রয়েছে। ২০০৯ সালে খবরে জানা গেছে যে, দেশের কোনও এক রাজ্যের নব নির্বাচিত ৫৯ জন বিধায়ক হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁরা অভিযুক্ত।

ঝাড়খণ্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৬ শতাংশ হলো কোটিপতি। জানা যায় এঁরা নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়ে যান টাকা ছড়িয়ে, কোনও নীতি অবলম্বন না করেই। আবার জানা যায় যে, বিহার, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা—এই তিনটি বিধানসভার বিধায়কদের মধ্যে ২৮৪ জন কোটিপতি। ADR-NEW তার রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্রের অর্ধেক বিধায়ক নিজেদের হলফনামায় জানিয়েছে তাঁরা অপরাধী। এরকম হরিয়ানায় আছে ১৭ জন বিধায়ক এবং দেখা যায় অধিকাংশ সাংসদই কোনও রীতি-নীতির পরোয়াই করেন না।

সংসদের দুই কক্ষে অধিবেশন বানচালের ঘটনা আজ রোজনামচায় পরিণত হয়েছে। মানুষ হতবাক যখন তারা দেখে তাদেরই নির্বাচিত সাংসদেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে মাইক্রোফোন, আসবাবপত্র ছুঁড়ে মারছে। এরকম অবস্থায় স্পীকারকে সদর্থক ভূমিকা নিয়ে শুধু তাদের বহিষ্কার করলে চলবে না বরং তাদের সাংসদপদ খারিজ করতে হবে। দুঃখের ব্যাপার হলো, সাংসদরা পাকা অপরাধীদের মতো আচরণ করলো যখন ২০০৮ সালে রাজ্যসভায় ১০৮তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ হয়। পেশ করা বিলের বিরোধিতা সঙ্গত হলেও সেই বিরোধিতা প্রকাশ করতে গিয়ে সাংসদরা চেয়ারম্যান হামিদের টেবিলে উঠে পড়ে এবং মাইক্রোফোন ভেঙ্গে দেয়। এরকম আচরণের মাধ্যমে সভ্য মানুষের পরিচয় দেয়নি সেদিনের সাংসদরা। এদের সঠিক পথে চালাবার কোনও আইন নেই বটে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। সমস্যা হলো এদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনও নেতা দেশে নেই।

আমলারাও কম কিছু নয়। তাঁদের ব্যাপারে জানতে গেলে সঞ্জয় বাগচীর "The Changing Face of Bureaucracy" পড়তে হবে। এই বইতে তিনি বলেছেন যে, দুর্নীতির বিষয়ে সব আই এ এস চাকুরে দলবদ্ধ। তাঁরা টাকা বানাচ্ছেন অদ্ভুত উপায়ে। প্রতিটি বরাত যা তাঁদের মাধ্যমে অনুমোদিত হয় তা হয় তাঁদের হাতকে তৈলাক্ত করেই। বাগচী দেখিয়েছেন যে, "সিনিয়ার আই এ এস আধিকারিকরা অভিযোগ করেন যে, ৭০ শতাংশ আই এ এস ক্যাডারভুক্ত তরুণ অফিসার মাত্রই দুর্নীতিগ্রস্ত"। আমাদের স্মরণে থাকতে পারে যে, একজন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই অপরাধে মামলা দায়ের করা হয় এইজন্য যে, সরকারি গোপনীয়তাসূত্র লঙ্ঘন করে তিনি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সংস্থার দুর্নীতি নিয়ে তাঁর পুস্তকে লিখেছেন। বলা হয় তিনি আইন ভেঙেছেন। দেশের উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিরা আড়াল করতে চায় পি জে টমাসকে।

দেশে আর কোনও ধর্মনিরপেক্ষ নেতা নেই। শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মতো মানুষকেও রাজনৈতিক নেতারা দূরে সরিয়ে রাখেন। কেননা তিনি বারানসীতে জল বয়ে নিয়ে যান। আমাদের নেতারা মার্কিন দূতের কাছে দেশের তথ্য পাচার করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, এঁরা নিজেদের ধন্য মনে করে বিশ্বের শক্তিধর দেশের দূতের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করেন। আমাদের তথাকথিত নেতারা দিল্লিতে বসে ভয় পান মুখ খুলতে এবং এঁরা আবার নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত প্রধানমন্ত্রীর গদি নিয়ে। এল কে আদবাণীর মতো মানুষ যাঁর বয়স হয়েছে তিনি তাঁর অশক্ত শরীর নিয়ে দিল্লীর বাইরে যেতে পারেন না গ্রামের বা শহুরে শ্রোতাদের বক্তব্য শুনতে। কিন্তু অন্য দল এমনকী সিপিএমের নেতারা কী করছেন?

বর্তমানে দেশে মাত্র দুটি জাতীয় দল রয়েছে—কংগ্রেস আর বিজেপি। বাকি সব আঞ্চলিক দল। কেউ ভাবতে পারে না যে করুণানিধি রাজস্থানে গিয়ে ভাষণ দেবেন, কিংবা মমতা এসে তামিলনাড়ুতে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের নেতারা নিজেদের রাজ্য-রাজনীতিতেই আবদ্ধ রেখেছেন। নেহেরু, সুভাষ বোস, জয়প্রকাশের যুগ শেষ। আমাদের নেতারা হলেন সংকীর্ণ হৃদয়ের, উচ্চাশা তাঁদের সাধ্যাতীত। বিচারব্যবস্থা এমন নয় যে, সুবিচারের আশায় বিচারকদের দিকে তাকাতে পারি, আস্থা রাখতে পারি। ভাবুন, রাজ্যসভায় এক কমিটি সিকিম উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ষোলোটি অভিযোগ এনেছে। আমরা কোথায় চলেছি?

রঙের নয়, গুণগত পরিবর্তন চাই

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বেশ কিছুদিন ধরে রাজনীতি ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন' কথাটা শুনে আসছি। আমাদেরও মনে হয়েছে—একটা পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। গত পঁয়তিরিশ বছর ধরে যে অপশাসন রাজ্যের ওপর চেপে রয়েছে, তার বদল অনেক বছর আগেই দরকার ছিল—নানা কারণে সেটা হয়নি। কিন্তু এই রাহুগ্রাস থেকে রাজ্যবাসীকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু আমাদের কাছে পরিবর্তনের অর্থ নিছক দলগত ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস নয়—আমরা চাই গুণগত পরিবর্তন, সামগ্রিক পরিবর্তন। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যালটের মাধ্যমে একটা নীরব বিপ্লব সংঘটিত করা যাতে এই রাজ্য আবার সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে সর্বস্তরে। যে ক্ষতি এত বছরে হয়েছে, তার পূরণ কখনও সম্ভব নয়, কিন্তু দেরিতে হলেও পুনর্গঠনের কাজটা সাঙ্গ করতেই হবে অবিলম্বে। কাজ করতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

আর্থিক ব্যবস্থা

শুরু করতে হবে অর্থনৈতিক দিক থেকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার জমি-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড।

● রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনীতিবিদের একটা 'প্যানেল' জানিয়েছে যে, আর্থিক বিকাশের প্রথম পর্বে কৃষি ও শিল্পকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। কিন্তু ক্রমে ঝোঁকটা শিল্পের দিকে বাড়াতে হবে। তার বিকল্প-ব্যবস্থা হলো—কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে ছকটা তৈরি করা এবং ক্রমে শিল্পের দিকে গুরুত্ব দেওয়া।

এই রাজ্যে এর কোনটাই হয়নি। সুতরাং এই ব্যাপারে এক বিন্দু দেরি না করে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ শুরু করতে হবে।

● জাপানের 'মেইজী রেস্টোরেশন' আমাদের আরেকটা শিল্প দিয়েছে। সেখানে কৃষির উন্নয়ন কৃষকের আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। তাতে কৃষকের জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণ হয়েছিল—বেড়ে গিয়েছিল তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা। এভাবে কিন্তু কৃষি ও শিল্পের যথেষ্ট এক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

● প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্লান দত্ত দেখিয়েছেন—তাইওয়ান এশিয়ায় একর প্রতি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জলসেচ, উন্নত সারের যোগান, সমবায়, কৃষকদের বয়স্ক-শিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে (প্রগতির পথ, পৃঃ ১৬)। অতএব একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা এখনই দরকার।

● আরেক গুণী অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, দরকার ক্রমে কৃষিতে বাড়তি জমিকে টেনে আনা ও বিভিন্ন ঋতুতে একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানোর চেষ্টা করা। (ভারতের আর্থিক উন্নয়ন, পৃঃ ২০)।

বামফ্রন্ট সরকার উল্টো পথে হেঁটে এই রাজ্যের সর্বনাশ করেছে। বন্ধ্যা পাথুরে জমিকে শিল্পের কাজে লাগিয়ে এবং অন্য জমিকে কৃষিতে আনতে হবে। নিতে হবে বহুমুখী চাষের ছক।

● প্রত্যেক জেলার কৃষি-দপ্তরকে বেশি করে কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে বিজ্ঞান-গবেষণাকে কৃষির কাজে লাগানো যায়। সেই সঙ্গে দরকার সমবায়-ব্যবস্থা, ফসল-সংগ্রহ, বিপণন ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা।

● এই রাজ্যে ধান, আলু ও সব্জী হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে—আর সব কিছু আনতে হয় ভিন রাজ্য থেকে। এই অবস্থা চলতে পারে না। উৎপাদনকে বহুমুখী করতেই হবে।

আরেকটা কথা। অন্ধ্রের মানুষ মাছ খান না, কিন্তু অন্ধ্র মাছ সরবরাহ করে অন্য রাজ্যে এবং তাতে বেশ মুনাফা হয়। এই রাজ্যেই উদ্বৃত্ত আয় দিয়ে সমৃদ্ধির কাজ করা যায়—(ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায়— পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার কারণ, পৃঃ ৬৭)।

রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবার কথা ভাবলে লজ্জা হয়। সমস্ত পরিকাঠামোটাই নষ্ট হয়ে গেছে অকর্মণ্যতার কারণে। সরকারী হাসপাতালগুলোকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। দরিদ্র মানুষ সেখানে যান বাধ্য হয়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' ভাগ্যে জোটে।

● ডঃ গৌতমকুমার সরকার মন্তব্য করেছেন 'সবুজ বিপ্লব' পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে---এই রাজ্য কিন্তু তার সুফল তেমন নিতে পারেনি—(ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃঃ ১৯২)।

● এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ছক তৈরীর জন্য একটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে হবে। এটা নিছক পেশাদার রাজনৈতিক নেতার কাজ নয়।

শিল্পায়নের জন্যও দরকার একটা উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্য নেওয়া। সেক্ষেত্রেও কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে—

● ভারী শিল্প, অন্যান্য বৃহৎ শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটীর শিল্পের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচনা করতে হবে। শিল্পায়নটা হবে একটা পরিকল্পিত ব্যাপার---বামফ্রন্টের খামখেয়ালীপনার স্থান এক্ষেত্রে থাকতেই পারে না।

● এর জন্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কতো কৃষি জমির ওপর হামলে পড়ার দরকার হয় না। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিল্পকে

ছড়িয়ে দিতে হবে, বেছে নিতে হবে বন্ধ্যা ও পাথুরে জমি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গানার মীর্ডাল লিখেছেন, এই ধরনের ব্যবস্থা নিলে উন্নয়নের আঞ্চলিক ভারসাম্যও রচিত হয়---(ইকনমিক থিওরী অ্যান্ড আন্ডারডেভেলাপ্‌ড্‌ রিজিয়ান্স, পৃঃ ৪২-৪৩)।

● রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে—সেগুলোকে খোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। দরকার হয়, অনুদান দিতে হবে উদ্যোক্তাদের। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা যদি কমে যায়, তাহলে অন্যকিছু তৈরি করতে হবে। তেমনি বন্ধ চা-বাগানকেও কাজে লাগাতে হবে।

● অম্লান দত্ত মনে করেন, আগে দরকার ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি অনুযায়ী শিল্প। এগুলো 'লেবার-ইন্টেন্‌সিভ'—অর্থাৎ এতে পুঁজির তুলনায় শ্রমিক লাগে বেশি—(অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য—ইন্ডিয়া'জ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, পৃঃ ১৮৭)। এই ধরনের শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ডঃ ভবতোষ দত্তও বলেছেন—(ইকনমিক অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, পৃঃ ১৭৩)।

● আসলে শিল্পায়ন একটা সার্বিক ব্যাপার। সিঙ্গুরে একটা মোটর- কারখানা বা নন্দীগ্রামে 'হাব্‌' করলেই শিল্পায়ন হয় না। এটা একটা সামগ্রিক বিপ্লব। অর্থনীতিবিদ ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, সেই রকম একটা বিপ্লব ঘটাতে হলে আমাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে পরিবর্তন দরকার, যে উদ্যোগ প্রয়োজন, সেই রকম আর্থিক প্রচেষ্টার কোনও লক্ষণ নেই'—(চিন্তার মুক্তি, পৃঃ ১৩২)।

মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে বলেছেন, ৯৯ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। সবার জন্য স্কুল কোথায়? বহু জায়গায় স্কুল ঘরের অভাবে গাছের তলায় লেখাপড়া চলে। আবার অনেক স্কুল আছে যার মাথার ওপর ছাদ নেই।

● সবচেয়ে বড় কথা—সমগ্র প্রক্রিয়াটা হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। শিল্পের জন্য জমি নিতে হবে চুক্তির মাধ্যমে—বন্দুক দিয়ে নয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

গত তিন দশকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। নতুন করে গড়া দরকার শিক্ষা কাঠামো।

● ইংরেজীকে তুলে দিয়ে একটা প্রজন্মের সর্বনাশ করা হয়েছে। তাই ইংরেজীকে আগের মতো ফিরিয়ে আনতে হবে। সংস্কৃতকে দিতে হবে প্রাপ্য মর্যাদা।

● সিলেবাসে সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কল্পানুসারী অ্যাডিশানালের সোনার পাথরবাটির বদলে আগের মতো গদ্য, কবিতা-প্রবন্ধকে গুরুত্ব নিতে হবে।

● এই প্রজন্মের মেরুদণ্ড গড়ে তোলার জন্য প্রাচীন ভারতের মহত্ত্ব, গীতার সংক্ষিপ্তসার, অগ্নিযুগের কাহিনী ইত্যাদি শেখাতে হবে।

● সবচেয়ে বড় কথা—বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয় থেকে সরকারের কালো ছায়া দূর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বশাসিত সংস্থা—এমনকী, বৃটিশ-যুগেও তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়নি, এখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন—'বিশ্ববিদ্যালয় আমরা চালাই'। কোনও সভ্য দেশে এগুলো কিন্তু সরকার চালায় না। উপাচার্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদের নিযুক্ত করতে হবে শুধু গুণগত দিক বিবেচনা করে।

● গলদ রয়ে গেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাদের দূর করতে হলে অধ্যাপক অলোকেন্দু সেনগুপ্তের 'শিক্ষা' গ্রন্থটা পড়ে নেওয়া দরকার। ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্যের 'রেড হ্যামার ওভার দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি'—বইটাও হতে পারে একটা মূল্যবান পাথেয়।

● মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে বলেছেন, ৯৯ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। স্বরচিত সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কিছু হবে না। এই রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলে যায় ২৫ লক্ষ শিশু, কিন্তু মাধ্যমিক দেয় ৫-৭ লাখ কিশোর-কিশোরী। বাকিরা কোথায়? কেন তারা 'ড্রপ-আউট'? আর্থিক কারণ যেমন দূর করতে হবে, তেমনি বাড়াতে হবে শিক্ষার সুযোগও। কেন এখন এই রাজ্য শিক্ষায় বিহারের পেছনে ৬ নম্বরে, তার খোঁজ নিজেই হবে।

স্বাস্থ্য-পরিষেবা

● এই রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবার কথা ভাবলে লজ্জা হয়। সমস্ত পরিকাঠামোটাই নষ্ট হয়ে গেছে অকর্মণ্যতার কারণে।

● ধনীদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের নার্সিংহোম, বিদেশী-ধাঁচের বেসরকারী হাসপাতাল। ক্ষমতায় না কুলোলেও সেখানে নিম্নবিত্তরাও ছুটছেন বাঁচার আশায়। জীবন নিয়ে এক নারকীয় ব্যবস্থা চলছে সেখানে।

● তাদের স্বার্থে সরকারী হাসপাতালগুলোকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। দরিদ্র মানুষ সেখানে যান বাধ্য হয়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ডেথ্‌ সার্টিফিকেট' আনেন। আগে ওষুধ-পথ্য দেওয়া হোত, এখন কিনতে হয়। ইঁদুরে রোগীর চোখ তুলে নেয়, সদ্যোজাতকে বেড়ালে খায়। নার্স-ডাক্তারকে পাওয়া যায় না।

● গ্রামাঞ্চলে কিছু হেল্‌থ্‌-সেন্টার আছে ঠিকই। কিন্তু সেগুলো থেকেও নেই—ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য—কিছুই থাকে না সেখানে।

● বিলেতী ডিগ্রিধারী ডাক্তাররা আটশো টাকাও 'ভিজিট' নেন। বিনা কারণে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট্ করতে দিয়ে সেখান থেকেও মুনাফা লোটেন।

● কলকাতার বাইরে সরকারী ডাক্তার যেতে চান না পরিকাঠামোর অভাব আছে বলে। সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা।

পরিবহণ-সমস্যা

পরিবহণ-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে সামগ্রিকভাবে।

● বিধানবাবুর সময় সরকারী বাস চালু হয়েছিল—এখন চলে এসেছে মিনি, অটো, বেসরকারী বাস। এগুলো আদৌ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। তার ফলে ভাড়া বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। এই অব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

● বেসরকারী বাস লাভে চলে—আর সরকার বাস-ট্রাম চালায় ভর্তুকী দিয়ে। বিধানবাবু ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়াতে চাওয়ায় যারা ১৬টা ট্রাম পুড়িয়েছিল, তারা এখন বাসের ন্যূনতম ভাড়া করেছে চার টাকা। একটা তদন্ত কমিশন বসিয়ে এর সুরাহা করতেই হবে।

● গঙ্গার সংস্কার করে লঞ্চ্-ব্যবস্থা বাড়ানো যায় কিনা, সেটাও দেখতে হবে।

যখন খুশি ভাড়া বাড়ছে, তাতেও নিয়মিত বাস পাওয়া যায় না। রাস্তাঘাট যেন মরণফাঁদ। জীবন হাতে নিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করছেন, আকছার দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে মানুষকে।

পুলিশ ও প্রশাসন

একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুলিশ ও প্রশাসনের মেরুদণ্ডও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানেও আনতে হবে পরিবর্তন।

● পুলিশের মধ্যে ইউনিয়ান ঢুকিয়ে তাদের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে রাজনীতিতে। এই অবস্থার বদল দরকার।

● পোস্টিং, প্রমোশন, প্লট-বিলি ও অন্যান্য সুবিধে দিয়ে পুলিশকে দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ কাজ করবে আইন অনুসারে। কিন্তু তাদের এখন কাজ করতে হয় দলীয় নেতাদের নির্দেশে। তাই কখনও তারা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয়—(ডঃ বাসুদেব চ্যাটার্জী—পুলিশ-অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃঃ ১৫১)

● আমলাদের অবস্থাও একই রকম। দশ/বারো জনকে ডিঙিয়ে যেমন কাউকে মুখ্যসচিব করা হয়েছে তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার ধরে দেওয়ায় একজন স্বরাষ্ট্র-সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, একটা মেরুদণ্ডহীন আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করা।

উপসংহার

● অল্প কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরা হলো। কিন্তু অসুখটা রয়েছে অনেক গভীরে এবং সেটা জটিল হয়ে উঠেছে। অনেক গবেষণা ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই আনতে হবে এক নবজাগরণ, গড়তে হবে নতুন বাংলা।

পরিবর্তন চাই, না উন্নয়ন চাই?

দেবব্রত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হাল-হকিকৎ দেখে মনে হচ্ছে যদি অঘটন না ঘটে, তবে তৃণমূল কংগ্রেস এবার রাজ্যে সরকার গড়বে। কিন্তু এই দলের মাতব্বররা তো আসলে কংগ্রেসী ঘরানার লোক। অভিজ্ঞতায় বলা যায় এ ঘরানার নেতারা আগ্রহী রাজনৈতিক কেরিয়ারে এবং টাকায়, এ দুটি পরম্পরা পরস্পর সংযুক্ত। ফলে মাস্তানি, তোলাবাজি, দুর্নীতি ছিল আছে থাকবেও। কিন্তু 'দিদি'র ডাকে যে অসংখ্য নতুন ছেলেমেয়ে এসেছে তারা অনেকে গরীব ঘরের, শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছাঁটাই শ্রমিক, নানা ধরনের দিনমজুর ঘরের বেকার আধা-বেকার ছেলেমেয়ে, গ্রামের অনিয়মিত কর্মী বা বেকার। এদের জন্য কর্মসংস্থানমুখী চিন্তা টি এম সি-কে করতেই হবে। যে চিন্তা নয়া উদারনীতি চৌহদ্দির মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই চিন্তার কশাঘাত আগামীদিনে টি এম সি-কে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এবং টি এম সি-ও এই মাকড়সার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস দলটি হচ্ছে আসলে কংগ্রেসের বাই-প্রোডাক্ট। রাজ্যে ৩৪ বৎসর ক্ষমতায় থাকা দলটির পরিবর্তন যারা চাইছে সেই দল দেশের স্বাধীনতার পর থেকে ৬৪ বৎসরের মধ্যে ৫৮ বৎসর কুর্সি দখল করে কংগ্রেসের একটি পরিবার দেশ শাসন করছে—তার পরিবর্তন চাইছে না। এ দলের আদর্শ কি—নীতি কি? 'পরিবর্তন' খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে এমন যারা ভাবছেন তাঁদের দিবাস্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙবে। তবে কি পরিবর্তন মূল্যহীন? কখনওই না, স্বৈরাচারী জনবিরোধী সি পি আই (এম) দলকে গদিচ্যুত না করতে পারলে পশ্চিমবাংলার সদ্য জাগ্রত জনজাগরণ থমকে দাঁড়াবে। বর্তমানে রাজ্যে যে জনশক্তি সংঘবদ্ধ ভাবে তৈরি হয়েছে—সেটি দাঁড়িয়েছে একটি বিন্দুতে, যেনতেন প্রকারেণ সিপিআইএম-এর অপশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া। এই মুক্তির লোভে 'রজ্জু' ভেবে সাপকে ধরে বাঁচতেও দ্বিধা করছে না। কিন্তু পরিবর্তনের পরেও যখন পরিবর্তন দূর অস্ত দেখা যাবে তখন শুরু হবে নুতন চেতনার আবির্ভাব। কিন্তু লড়াইয়ের পরেও সেই অত্যাচারী সরকার ফিরে এলে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হবে তীব্র হতাশা। আবার স্বৈরাচারীরা ফিরে এলে রাজ্যে কি প্রবল অত্যাচার চালাবে তা কল্পনা করা কঠিন নয়।

তাই পরিবর্তন হোক বা না হোক 'পরিবর্তন' চাই। সত্যিকার পরিবর্তন কোন্ পথে? পরিবর্তনের কি পরিকল্পনা আছে 'দিদির' ফাইলে তা জানা যায়নি। কংগ্রেস দলের নেতাদের কাছে মিত্র হিসাবে 'মমতা ব্যানার্জীর' চেয়ে সিপিএম বেশী গ্রহণযোগ্য, তার কারণ দলের কিছু কিছু আবেগপ্রবণ সাময়িক চাপকে বাদ দিলে সিপিএম-এর সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনও পার্থকই নেই। দুটি দলই নয়া উদারনীতিতে বিশ্বাসী। জাতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী বাণিজ্য বিশেষ করে রপ্তানির গুরুত্ব বাড়ানোর প্রশ্নে

> **"পরিবর্তন পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণ করবে মানুষ; আমলা, মন্ত্রী বা বিশেষজ্ঞ নয়। উন্নয়ন শিল্পায়নের জন্য চাই শাসকের মানসের পরিবর্তন। রামকে পরিবর্তন করে শ্যামকে নয়।"**

দু-দলই লালায়িত, কেন্দ্রে 'সেজ' আইন তৈরি হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সেজ' আইন প্রণয়ন করে। মমতা ব্যানার্জী কি নয়া-উদারনীতির বিপক্ষে? লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিবেক দেবরায়ের লেখা 'ট্রান্সফর্মিং ওয়েস্ট বেঙ্গল' ভাষ্যটিতে দেখা গেছে একেবারেই নয়া উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি, চুক্তিচাষ, প্রতি ব্যাপারে প্রাইভেট পুঁজিকে আহ্বান। তাহলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মমতা ব্যানার্জীর ইতিবাচক ভূমিকার অর্থ কি? শুধু লোকখেপানো? মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতি হচ্ছে জনপ্রিয়তার উপর নির্ভরশীল পপুলিস্ট রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জীর পপুলিস্ট রাজনীতি তার সম্ভাব্য কার্যক্রমকে অনিশ্চিত করে রাখে। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে তা মমতা ব্যানার্জী যেমন বুঝছেন সেইমতো কৌশল নির্ণয় করেন, ফলে তার নীতি পরিবর্তনশীল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিচারে আবেগময়ী চঞ্চলমতি এক নারী। নন্দীগ্রামে যখন সিদ্দিকুল্লার নেতৃত্বে ভূমি আন্দোলন শুরু হয় তখন মমতা ব্যানার্জী মেট্রো সিনেমার কাছে সিঙ্গুর ইস্যু নিয়ে অনশন করছিলেন। কিন্তু যখনই দেখলেন নন্দীগ্রামে সিদ্দিকুল্লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গ ভূমি আন্দোলন জোরদার করেছে তখন তিনি সেই আন্দোলন হাইজ্যাক করে তৃণমূলী আন্দোলন করে তুললেন। আসলে ইনি অন্যের নেতৃত্ব পছন্দ করেন না—সেই চরিত্র তিনি তার নিজের দলেও প্রতিষ্ঠা করেছেন, আসলে ইনি 'আই' শব্দে বিশ্বাসী। 'উই' কথাটা উনি মানতে চান না। যাঁর অভিধানে আমাদের কথা নেই শুধু নিজের কথা আছে তাঁকে মাত্র 'পরিবর্তনকামী'ই বলা যেতে পারে, অন্য কিছু নয়।

পরিবর্তন পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণ করবে মানুষ; আমলা, মন্ত্রী বা বিশেষজ্ঞ নয়। উন্নয়ন শিল্পায়নের জন্য চাই শাসকের মানসের পরিবর্তন। রামকে পরিবর্তন করে শ্যামকে নয়। জঙ্গলমহলের আন্দোলনের প্রথম দিকে যখন গাছ কেটে সরকারী গাড়ি আটকানো চলছে তখন কিন্তু বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধানে গিয়ে আন্দোলনের কর্মীদের বললেন সরকারী গাড়ী না চললে উন্নয়ন হবে কেমন করে? উত্তর, আগে আপনাদের উন্নয়ন মানে আমাদের উচ্ছেদ করে কারখানা। কখনও পরিবর্তন -উন্নয়ন-শিল্পায়ণ শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়। একজনের উন্নয়ন, অপরের বিস্থাপন। গ্রামে গরীব মানুষের অসহায় অবস্থার 'সিচুয়েশন'টি হাতিয়ার করে কিছু সুবিধালোভী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যদি হঠাৎ পরিবর্তনকামী চরিত্রের রূপ নিয়ে স্বজন হারানো মানুষের পাশে রুমাল দিয়ে তাঁদের চোখের জল মুছে দেয়—সেইটি স্থানীয় লোকেদের সুখের দিশারী হওয়া বোধ হয় নয়।

পরিবর্তন করতে হলে প্রথমেই অর্থনৈতিক চিন্তা শুরু করতে হবে জীবিকা কর্মসংস্থান থেকে। মানুষের হাতে কাজ থাকলে সে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজের স্বার্থরক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে মর্যাদার সঙ্গে। কোনও 'দলদাস' হতে হবে না। আর সব বেকার অর্ধ-বেকার মানুষ কাজ করলে কাজের প্রবৃত্তি বাড়বে। আমাদের দেশে সবচেয়ে দরকার শ্রমনিবিড় কাজ কৃষি। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে—তাই সস্তা জল, চাই সুলভ ইনপুট, সহজ ঋণ, এন আর ই জি পি ধরনের কাজের গ্যারান্টি চালু রাখতে হবে। গরীবের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পক্ষে উপকারী উৎপাদনশীল কাজ করাতে হবে। গরীবদের হাতে পয়সা এলে তারা দলে দলে নানা জিনিস কিনতে চাইবে—শ্রমনিবিড় ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে এই চাহিদা মেটাতে হবে। বড় পুঁজির হাত থেকে এই বাজারগুলো রক্ষা করতে সরকারী হস্তক্ষেপ লাগবে। এটাই পরিবর্তন — শাসনকক্ষে এক ছবি খুলে অন্য ছবি—পরিবর্তন নয়।

পরাহিতব্রতী

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিনি এলেন, দেখলেন এবং অবশেষে জয়ও করলেন। ঘড়ির কাঁটা তখন সবে সাড়ে সাতটা পার করেছে। কল্লোলিনী তিলোত্তমা-র বুকে সেটাকে এমন কিছু রাত্রি বলা যাবে না। তবে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের কথা স্বতন্ত্র। মানুষের দেহে বাইপাসের মতোই অবস্থা তার। সেখানে রাত নেমে আসে সন্ধ্যের মধ্যেই। জনমানবশূন্য, কোলাহলহীন রাস্তায় পরিণত হয় সেটি। কেবল মধ্যে মধ্যে ছুটে চলা বাস কিংবা অন্য কোনও যানবাহনের ফ্লাডলাইট জানান দেয় কলকাতার পূর্ব-প্রান্তের প্রশস্ত অঞ্চলটির অস্তিত্ব। এমনই সময় সেই ই এম বাইপাসের ধারে ব্রেক-ডাউন হলো একটি বাসের। ওই বাসের জনৈকা আরোহী-র পরিচয় জেনে রাখা ভাল। তিনি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, মিশন হাসপাতালে নার্সিং অ্যাটেনড্যান্ট হিসেবে কর্মরত। দিনটা ছিল গত ২৮ জানুয়ারি।

বাসের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটেছে তখনকার মতো, সুতরাং কি আর করেন প্রিয়াঙ্কা! অগত্যা হেঁটেই পরবর্তী বাসস্টপে যাবার মনস্থির করেন তিনি (প্রসঙ্গত, বাইপাসের ধারে বাসস্টপগুলোর দূরত্ব নিতান্ত কম নয়। মোটামুটি মাইলটাক দূরত্ব তো হবেই)। সেই সময়ই দৃশ্যটা এল নজরে। প্রসববেদনায় পথের ধারেই কাতরাচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা (অত রাতে, যতই ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী তখন সবেমাত্র সাড়ে সাতটা বাজুক, বাইপাসে ওটা বেশ রাত-ই; বাইপাস কিন্তু মেয়েদের জন্য বেশ বিপজ্জনক)। প্রিয়াঙ্কার তখনই মনে হয়েছিল—'দু'দুটো প্রাণ

প্রিয়াঙ্কা

আমার সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।'

সেই ডাক অগ্রাহ্য করার স্পৃহা প্রিয়াঙ্কা'র ছিল না। কিন্তু জনমানবশূন্য পাণ্ডব-বর্জিত এলাকায় দোকানপাট, মানুষজনই বা কোথায়? পেটে যতই নার্সিং-প্রশিক্ষণের বিদ্যেটুকু থাক, হাতে-কলমে কোনও গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে নাড়া-চাড়ার অভিজ্ঞতাটুকু তাঁর হয়নি। পরিস্থিতি বিষম বুঝে নিজের মোবাইল ফোনের টর্চ-ই ব্যবহার করেন প্রিয়াঙ্কা।

দোকান-পাট নেই, সুতরাং সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট জোগাড় করাও মাথায় উঠেছে। উপায়ন্তর না দেখে একটিমাত্র ব্লেড ও একটি রবারব্যান্ডের সাহায্যে প্রসববেদনা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সেই মহিলাটির প্রসব করান প্রিয়াঙ্কা। সদ্যোজাতের সঙ্গে তার মাকেও এরপর বাড়িতে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হন তিনি। প্রিয়াঙ্কার এই অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য সদ্যোজাত কন্যার নামও তাঁর নামেই করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সেই মহিলা আর তাঁর স্বামী।

২৩ বছরের যুবতী প্রিয়াঙ্কা'র জীবনে এই ঘটনা আগামীদিনে নিশ্চয়ই বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ একদিকে এরফলে তিনি যেমন আরও পেশাদার হয়ে উঠবেন, তেমনি অন্যদিকে এনিয়ে ইতিমধ্যেই ভাগীরথী নেওটিয়া উওম্যান এবং চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে উওম্যান অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ডের প্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা যাই পান না কেন ব্যক্তিগতভাবে, সমাজের প্রাপ্তিটা আরও বেশি। যে মূল্যবোধের পাঠ ডাক্তারির ছাত্রটি শিক্ষারম্ভে পায়, যে শপথবাক্য তারা তখন উচ্চারণ করে, ভবিষ্যতের কালপ্রবাহে তার চাইতে বড় অভিশাপ আর কিছু হয় না। নার্সিং-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা দেখালেন প্রথম দিনের সেই মূল্যবোধের পাঠ, সেই শপথবাক্যের মহিমা তাঁর কাছে আজও একইরকম রয়েছে। বরং তার ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘ কয়েক বছরের মাজা-ঘষায় আরও বেড়েছে।

সমাজ দেখল, সেই মূল্যবোধ আজকের মূল্যবোধহীন সমাজে, সেই শপথবাক্য আজ মিথ্যে-প্রশস্তির যুগেও আশীর্বাদ হয়ে এসেছে মানব-সমাজের কাছে।

গীতা পোড়ানোর প্রতিবাদে সোচ্চার মঠ-মন্দির রক্ষা কমিটি

সংবাদদাতা।। গত ২ এপ্রিল, ২০১১-তে বাংলাদেশের শ্রীহট্টে হিন্দুদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ্য দিবালোকে জন সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন করে পোড়ানো হয়েছে বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের মঠ মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষা কমিটি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা জানিয়েছেন।

আজ থেকে ৫৫৫ বছর পূর্বে শ্রীহট্ট যা বর্তমানে সিলেট এর বিয়ানীবাজারস্থ খাঁসা পণ্ডিত পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাস ঠাকুর। পাঁচ শতাধিক বছরের পুরাতন মন্দির ও প্রাচীন নির্মাণ স্থাপত্য এখনও খাঁসা পণ্ডিত পাড়ার শ্রীবাস ঠাকুর ও পণ্ডিতদের ঐতিহ্য বহন করছে।

স্থানীয় ভূমিদস্যু চক্র যা সরকারী দলের পরিচয় বহনকারী ব্যক্তি যাদের গডফাদার জনাব দিপু। জনাব দিপু ও তার সঙ্গীরা পণ্ডিতদের পরিত্যক্ত বাড়ী ও অন্যান্য জমি দখল করেই সন্তুষ্ট নয়। সে ইতিমধ্যে একটি শিবমন্দির ভেঙ্গে উক্ত স্থানে তার অনুগত সন্ত্রাসী চক্রকে বসিয়েছে এবং অপর যে মন্দিরটিতে বর্তমানে নিয়মিত পূজার্চনা চলছে সেটিও দখল করে কারিগরি বিদ্যালয় ও হাঁস মুরগী, ছাগলের খামার বানানোর লক্ষ্যে সরকারী কাগজপত্র তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই মধ্যে মন্দির দখলের জন্য সাবুল নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বর্তমান লক্ষ্মীনারায়ণ, পঞ্চতত্ত্ব ও শিবমন্দির প্রাঙ্গণে গত ২ এপ্রিল একদল দুষ্কৃতকারী আনুমানিক বেলা ১০টার সময় পূজার্চনা চলাকালীন হামলা চালায়। এ সময় মন্দিরের প্রণামী বাক্স লুটপাট ও বিগ্রহ ভাঙচুর সহ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রী সিদ্ধ গৌর দাস ব্রহ্মচারীকে হত্যার চেষ্টা চালায় এবং মন্দিরের সকল ভাঙ্গা বিগ্রহ পুকুরে ফেলে দেয়। মন্দিরে রক্ষিত সকল ধর্মগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জনসম্মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে বিয়ানী বাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এরশাদের আমলে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, হিন্দুরা হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। হিন্দুরা হারিয়ে ফেলি তাদের বহু সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার।

আজ বাংলাদেশের একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী 'হিবা' আইনের সাহায্যে যেখানে সামান্য খরচায় সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে সেখানে একজন সংখ্যালঘুকে অতি উচ্চ মূল্যে পূর্ণ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সমৃদ্ধ একজন মাদ্রাসা পাশ শিক্ষক যেখানে রেগুলার স্কেলে বেতন পান, সেখানে একজন কাব্যতীর্থ যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষক, বেতন পান সাকুল্যে ১২০ টাকা।

আজ এই দেশের আরও পাঁচজন নাগরিকের মতো সংখ্যালঘুরাও ট্যাক্স দেয়, যার একটি অংশ রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যয় করা হয় নওমুসলিম ও নও মুসলিমদের ভাতা প্রদানে। রাষ্ট্রে একদর্শী। সংখ্যালঘুদের আয়ের এক অংশ ব্যবহৃত হয় তাদেরই বিরুদ্ধে।

কিছুদিন আগের ঘটনা যা পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। ২২২নং লালমোহন সাহা স্ট্রিট, সূত্রাপুর, ঢাকাস্থ শ্রীশ্রী রাধাকান্ত জিউ মন্দিরটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মন্দির যা শ্রী মথুরা মোহন শাহ্ বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভূমিদস্যু হাজী ইসলাম উদ্দিন, হাজী আফজাল হোসেন ও ৭৭নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি হাজী আবুল হোসেন আবুল মন্দিরটি দখল করার হীন পাঁয়তারা চালিয়ে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে।

ঢাকার রামপুরায়, সেখানে ২০০-২২৫টি পরিবার বসবাস করছে, সেখানে একটি বিখ্যাত শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির অবস্থিত। হাতির ঝিল প্রকল্পের নামে এই মন্দির ও শ্মশানের ৭৫ শতাংশ জমি রাজউক দখল করে নিয়েছে যা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আঘাত এনেছে। এলাকার হিন্দু জনসাধারণ ভীত ও আতঙ্কিতভাবে জীবনযাপন করছে। তাদের কাছে মন্দিরটি প্রাণের চেয়েও প্রিয়, কারণ এলাকায় আর কোনও মন্দির নেই। এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মানিকগঞ্জ শহর হতে ২ কিঃমিঃ দূরে উকিয়ারা গ্রামে গোলক মণ্ডল ও শরৎ মণ্ডলের বসতি। তাদের ২৩ শতাংশ জমিতে দুই ভাইয়ের দুই পরিবার ও মন্দির বসতি। ওই এলাকার সরকার দলীয় সংসদ সদস্য জনাব জাহিদ মালিক মন্দির আক্রমণ করে ভাংচুর করে এবং তাদেরকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। তাদের দলিলপত্রাদি পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সংসদ সদস্য চাচ্ছেন তাদের জমিতে হাসপাতাল তৈরি করতে। কারও ব্যক্তিগত জমিতে হাসপাতাল তৈরি করা কতটুকু গণতান্ত্রিক? এভাবেই কি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে না?

রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ী, জমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল, সুন্দরী মেয়ে ছিনতাই করা, জোর করে ধর্মান্তর করা, উচ্ছেদ ও দেশান্তরণে বাধ্য করা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় হিন্দুদের সংখ্যা ৯ শতাংশ-এ নামিয়ে আনতে ২০১১ পরন্তু সময় লাগলেও বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কার বাস্তবায়িত হলে আগামী ৫ বছরে হিন্দুদের সংখ্যা ০ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করছি। অথচ ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে বছরের পর বছর চূড়ান্তভাবে নিগৃহীত হয়ে চলেছে হিন্দুরা। ২০০৯ থেকে ১ জুন ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে বহু হিন্দু ব্যক্তি খুন হয়েছেন, বহু হিন্দু নারী ও মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন, বহু হিন্দু পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে, অনেক পরিবারকে সহায় সম্বলহীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, অনেক ধর্মীয় মঠ-মন্দির-আক্রমণ করা হয়েছে, অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে এবং অনেকজনকে তাদের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মঠ-মন্দির রক্ষাকমিটি দাবী জানিয়েছে যে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং এই বৈরী পরিবেশ টিকে থাকার জন্য, নিজ ভূমিতে সম্মান ও ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সোচ্চার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে সংগঠিত হওয়ার জন্য হিন্দুদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জনগণের নাম করে জনবিরোধী কাজে সেরা সিপিএম

রমাপ্রসাদ দত্ত

বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামকে নষ্ট করেছে—একথা অনেকের মুখে শুনি। তার পুরোপুরি দোষ বামমার্গীদের দেওয়া যাবে না। অন্য পন্থীরাও তাতে তাল মিলিয়ে দলীয় স্বার্থ বুঝে নিতে চেষ্টা করেছে। কোথাও কোথাও বোঝাপড়া হয়েছে একদলের সঙ্গে অন্যদলের। এক নেতা বলেছে অন্যজনকে 'ঝামেলা করছিস কেন? তুই কি ভাগে পেয়েছিস? চুপ করে যা। তোকে পুষিয়ে দিচ্ছি।' এই পুষিয়ে দেওয়ার অঙ্ক কষায় দক্ষ অনেকেই। বামপন্থীরা সবটাই করেছে কৌশলে। অন্য পন্থীরা সেসব করতে গেছে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে এবং গোপনীয়তার বিদ্যা আয়ত্ত না করে। ফলে জানাজানি হয়ে গেছে। তেমন গুছোতে পারেনি। অন্যদিকে বামপন্থীদের ভাবভঙ্গি ভিজে বেড়ালের মতো। দুষ্কর্ম করার পর এমন ভাব মুখে ফোটানো থাকবে এবং আচরণে প্রকাশ পাবে যা দেখে সাধারণ বোধবুদ্ধির মানুষের আঁচ করার উপায় মিলবে না লোকটার আসল চেহারা কি। এভাবে ঢাকাঢুকি দিয়ে আত্মগোপন বা নানাধরনের মুখোশ পরে আসল মুখটা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বামপন্থীরা দক্ষ চূড়ামণি। বামপন্থীদের মধ্যে সি পি এম এক্ষেত্রে সেরা অভিনেতা। বামবিরোধীরা যতই লম্ফঝম্ফ করুক এধরনের কৌশলে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না বামপন্থীদের সঙ্গে। শিয়ালদের ঐক্য নিয়ে যে প্রবাদ আছে তা সকলের জানা হলেও বলি 'সব শিয়ালের এক রা'। এই কথাটা জানতে হবে—'সব সি পি এম-এর এক রা'। একে দলীয় শৃঙ্খলা হিসেবে বাড়তি নম্বর দিতে চান, দিতে পারেন।

সিপিএম দলই বামপন্থীদের পক্ষ নিয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। অন্যদের দমিয়ে এবং দাবিয়ে রাখছে বিভিন্ন কৌশলে। কখনও হুমকি দিচ্ছে কখনও মেকি তোয়াজ করছে, কখনও অল্পবিস্তর বল প্রয়োগের পথ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে এটা-সেটা উপহার দিয়ে খুশি রাখছে। সেই দলগুলো বুঝে গেছে সিপিএম-এর লেজুড় হয়েই যাহোক কিছু করে নিতে হবে। একক সামর্থ্যে কুলোবে না। সিপিএম অনায়াসে এই ক্ষুদে দলগুলোকে হটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তাতে লোকচক্ষে 'বামফ্রন্ট' বলে যে ভাবমূর্তিটা রয়েছে, 'অনেক দল একসঙ্গে কাজ করছে' লোকে ভাবছে—সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যারা খোঁজখবর রাখে তারা জানে সিপিএম পুরোপুরি মাৎস্যন্যায় চালাচ্ছে। কোনও শরিকদলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানান দেওয়ার সুযোগ নেই। সেই চেষ্টা কোনও কোনও নেতা কম বেশি করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছেন। সিপিএম এমন চাপ সৃষ্টি করেছে তাতে সেসব নেতা হয় দল থেকে বেরিয়ে গেছেন কিংবা সব অপমান হজম করে মুখ বন্ধ রাখার শর্তে দলে থেকেছেন। সিপিএম তলে তলে নজরদারি চালিয়েছে সেই নেতারা গোপন কিছু করছেন কিনা। সেজন্য দলীয় চর এবং পুলিশের চরকে ব্যবহার করেছে।

সিপিএম দল রাজ্যের সর্বত্র এই নজরদারি করবার ভালোমতো চালিয়েছে অঙ্ক কষে। কারা আমাদের পক্ষে কারা বিপক্ষে জেনে নেওয়ার সমীক্ষা চলেছে নানাভাবে বিভিন্ন কৌশলে। বিভিন্ন ধরনের ভোটের পর জেনে গিয়েছে কারা কোন্ পক্ষে ভোট দিয়েছে। শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। গোপন নির্দেশ গেছে গ্রাম-শহর সর্বত্র, আমাদের শত্রুদের চিনুন। আমাদের সমর্থন যারা করছে তাদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না। ছায়ার মতো অনুসরণ করুন। দলের মধ্যে যারা বেগড়বাই করছে, গোপনে অন্য মতলব আঁটছে তাদের জন্যে দুটো পথ থাকবে—হয় বসবেন, নয় সরবেন। এরকমভাবে বেশ কিছু দলীয় কর্মীকে সিপিএম খুন করেছে তাদের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে। কখনও পুলিশকে কাজে লাগিয়েছে, কখনও দলীয় ক্যাডার ব্যবহার করেছে, কখনও ভাড়া করা গুন্ডাদের দিয়ে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। আক্রমণ অনেক রকম পদ্ধতিতে হয়েছে। হুমকি, ভয় দেখানো, মারধোর, পরিবারের লোকজনকে হেনস্থা, সামাজিক বয়কট, ঘরে ডাকাতি করানো, আগুন লাগানো, ছেলেমেয়েকে অপহরণ, ধর্ষণ এসব কাজের জন্য পয়সা খরচ করেছে দল। শেষে খুনের ব্যবস্থা করেছে আর কোনও পথ না পেয়ে। খুন করার পর পুলিশের আর দলীয় কর্মীদের সাহায্যে প্রচার হবে—অন্য দল খুন করেছে।

আমরা এসব এতবছরে ঢের দেখেছি। গ্রামে গ্রামে ভয়ঙ্কর চেহারায় তা দেখা গেছে। শহরে চোরাগোপ্তা কারবার চলেছে। বড়ো শহরে অপরাধ করে দিব্যি লুকিয়ে থাকা যায়। পুলিশ বশংবদ হলে কে কাকে ধরবে। আর যাদের দিয়ে খুনজখমের কাজ করানো হয়েছে তাদের নেতারা সবসময় পুলিশের ভয় দেখিয়ে বশে রেখেছে।

১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে বরানগর কাশীপুরে নকশালপন্থীদের খুন করা হয়েছিল অঙ্ক কষে। ভূমিকা ছিল সিপিএম-কংগ্রেস আর পুলিশের। সিপিএম-এর এমন অনেকে সেসময় সক্রিয় ভূমিকা নেয়, যারা পরে দলসূত্রে বিভিন্ন রকমভাবে গুছিয়ে নেয়। কেউ কেউ জীবিত, অনেকে মৃত। পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ ভালোই। অথচ ঘটনার পর সিপিএম প্রচার করেছিল আমরা ঐসবের মধ্যে নেই। অনেক বছর পরে জ্যোতি বসু শহীদ বেদী উদ্বোধন করতে গেলে কানু সান্যাল বলেছিলেন, সেদিন বেপরোয়া খুন করে আজ ভণ্ডামো করছেন। তখন কিন্তু একথার প্রতিবাদ করতে পারেনি সিপিএম দল।

এ রাজ্যে বিভিন্ন পন্থীর মানুষ আছেন। আনন্দমার্গীরা রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মতো পথ আঁকড়ে ধরে কাজ করতেন বিভিন্ন জায়গায়। তাঁদের প্রভাব ছড়াচ্ছে দেখে সিপিএম সরাসরি সংঘাতের পথে যায়। ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল দিনের বেলা ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীকে বালিগঞ্জ রেল সেতুর উপর মেরে পুড়িয়ে রেল লাইনে ফেলে দেয়। সেই ঘটনা সিপিএম-এর কোন্ গৌরব বহন করেছে জানা নেই। তবে তারপর থেকে প্রতিবছর ঐদিনে সেতু জুড়ে আনন্দমার্গীরা মানুষের করোটি হাতে শপথ নেন সিপিএম-এর বিরুদ্ধে। সিপিএম-এর লোকজন ধারে কাছে ঘেঁষে না। এবং দলীয় গোপন নির্দেশ আছে, তিলজলায় আনন্দমার্গীদের ডেরার দিকে যাবে না। ওরা কিন্তু কংগ্রেস বা অন্য দল নয়। বদলা নেওয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি।

সিপিএম সর্বত্র আখের গোছানোর অঙ্ক ভালোমতো চালিয়েছে। তার ফলে গ্রামগুলো তছনছ হয়ে গেছে। গ্রামের এমন ক্ষতি এই রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও হয়নি। আমরা সব লক্ষ্য করেছি, কিন্তু প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে পারলাম কোথায়? সিপিএম সর্বত্র এমনভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে যার দরুন অনেকেই প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিপদ ডাকতে চায়নি। এই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে সিপিএম গণতন্ত্রের নাম করে। কংগ্রেসের এত বুদ্ধি বা ক্ষমতা ছিল না কখনও।

ভোট এসে গলে। সিপিএম এসময় লোকজনকে তোয়াজ করবে। মেকি ভদ্র-সভ্য মুখোশ পরে নেবে। নানারকম প্রলোভন দেখাবে। দলের ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ। অন্যান্য সূত্রেও আমদানি কম নয়। ভোটে জেতার জন্যে যা যা করা দরকার সবটাই ঠিকমতো করার জন্য বিভিন্ন স্তরে লোকজন তৈরি। সিপিএম এক্ষেত্রে দিশারী ভূমিকা নেওয়ায় অন্যরাও পিছিয়ে নেই।

মনে পড়ছে তারকেশ্বরে এক সিপিএম নেতা একটি হিমঘরের মালিককে বাগে আনতে না পেরে এক জায়গায় ডাকেন। নেতা টেবিলের উপর বসে পকেট থেকে রিভলবার বের করে রাখেন। তা দেখে হিমঘরের তরুণ মালিকও তাঁর অ্যাটাচি থেকে রিভলবার বের করে টেবিলে রাখতে নেতা ভয়ে বিস্ময়ে তাকান। হিমঘর মালিক বলেন, ২আমাদের সব অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে হয়। আপনি রাখলেন তো!' নেতা বুঝে যান সব মাটি সমান নয়। ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। তিনি অন্য সুরে কথা শুরু করেন। হিমঘর মালিক বলেন 'টাকাপয়সা দিতে হয় ব্যবসা করতে গেলে। তবে আমাদের পক্ষে মাত্রাছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়।'

যেসব ব্যবসায়ীকে সিপিএম কাজে লাগিয়েছে বিভিন্ন সময়ে, তারা যত টাকা দলকে বা নেতাকে দিয়েছে, তার বহুগুণ আদায় করে নিয়েছে অন্যভাবে। কতরকম কৌশলে জনগণের নাম করে জনবিরোধী কাজ করা যায় এ ব্যাপারে কমবেশি দক্ষ সব দলই। তবে দক্ষতায় ৯৯ শতাংশ নম্বর পাবার যোগ্যতা রয়েছে শুধু সিপিএম দলের।

তিরকি নয়, হরিচরণ মজুমদার

স্বস্তিকার ৬৩ বর্ষ ২৩তম সংখ্যায় (২১.২.১১) ''শাসক দলের বঞ্চনার ক্ষোভেই দার্জিলিং আজ অগ্নিগর্ভ'' শিরোনামে নিশাকর সোম লিখেছেন—''দার্জিলিং জেলায় হাতিঘিষা অঞ্চলে ঈশ্বর তিরকির (কংগ্রেস নেতা) জমি দখল নিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত'' বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল। ঘটনাটি হলো—১৯৬৭-এর ২৪ মে খোকন মজুমদারের নেতৃত্বে কৃষকেরা হাতিকীষ ও সরত ভাই রায় মাঝখানে নকশালবাড়ী থানার অধীনে বড়ঝড়ু জোতে হরিচরণ মজুমদারের (শিলিগুড়ি-নিবাসী) বেনামী জমি দখল নিতে গিয়ে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

—ক্ষীরোদ বিশ্বাস, নকশালবাড়ী, দার্জিলিং।

গাড়ি আটকে জরিমানা

গত মার্চ মাসে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক নৈরাজ্য চরমে উঠেছে। নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের দায়িত্ব পেতেই সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন, যেখানে-সেখানে যখন-তখন ধরপাকড়, হেনস্থা ইত্যাদির সঙ্গে নিরীহ নাগরিকদের অকারণ প্রহার, জরিমানা এসবও লেগে আছে। মোটর সাইকেল বা চারচাকা গাড়ির সমস্ত কাগজপত্র এমনকি সাইকেলেরও Cash Memo এবং Driving License দেখতে চাওয়া হয়েছে। না পারলেই বেধড়ক মার এবং জরিমানা করা হয়েছে। বিনা কারণে দু'চাকা/চারচাকার গাড়ী আটক করে পুলিশ তাদের কাজে লাগাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই চলছে অকথ্য অত্যাচার। এর বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দল বা সংবাদমাধ্যম বা অন্যান্য সংস্থা নীরব কেন তাও দুর্বোধ্য। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দুটি আকর্ষণ করছি।

—সুকান্ত আওন, জামালপুর, বর্ধমান।

'অনুবীক্ষণে বিজেপি'

সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে জনৈক পত্রলেখকের পত্রের জবাবে এই পত্রের অবতারণা। প্রথমে জানাই বিজেপির বাঙ্গালী নেতা খুঁজতে যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে তবে অত ভয় কিসের? পত্রলেখকের অবগতির জন্য জানাই যে বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। গত লোকসভায় ১৮২ জন সাংসদ ছিল। বর্তমান লোকসভায় ১১৬ সাংসদ আছেন। দেশের ৯টি রাজ্যে বিজেপি সরকার চালাচ্ছে। শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন তৃণমূল নেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সিপিএম-কে উচ্ছেদ করার জন্য সব বিরোধী দলকে নিয়ে মোর্চা গঠন করে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দাঁড় করাতে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অসাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের সকল জোট গঠনের কথা ঘোষণা করলে (দি স্টেটসম্যান ২২-৮-২০১০) বহরমপুরে তিনি যে জনসভা করেছেন তাতে মুসলিম লিগের সবুজ পতাকাধারী লোকজনদেরকেও দেখা যাচ্ছে, যে মুসলিম লিগের লেজের আগুনে দেশভাগের প্রাক্কালে ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছে। ১৬-৮-১৯৬৪ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম ৩ দিনে কলকাতা শহরে ২০ হাজার লোক খুন হয়েছে। টি এম সি যে রাজনৈতিক দলের বাম লতিকা সেই দল কংগ্রেসের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের ভাব-ভালবাসার কথা কারও অজানা নয়। এই সেইদিনও কম্যুনিস্টদের সমর্থন নিয়ে সরকার চালিয়েছে। প্রণববাবুও দিল্লিতে সিপিএম-এর 'আমাদের লোক' বলে পরিচিত। পক্ষান্তরে বিজেপি একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা সগর্বে ঘোষণা করে 'আমরা কম্যুনিস্ট বিরোধী'।

সিপিএম বিজেপি-কে এক নম্বর শত্রু মনে করে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজেপি বাঙ্গালীদের কাছে অচ্ছুৎ। বিশেষ করে ওপার বাংলার লোক মুসলিম লিগের হাতে মার খেয়ে মা বোনের ইজ্জৎ হারিয়ে যারা এপারে এসেছে, যে শ্যামাপ্রসাদের জন্য আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছি সেই শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর যোগ্য মর্যাদা পাননি। কংগ্রেস যদি ভোট প্রচারের জন্য অবাঙ্গালী নেতা-নেত্রীদের পশ্চিমবঙ্গে আনতে পারে তবে বিজেপি তাদের সর্বভারতীয় নেতাদের আনতে দোষ কোথায়? টি এম সি একটি আঞ্চলিক দল। তাদের কোনও ক্ষমতাই নেই অন্য রাজ্য থেকে কোনও নেতাকে এনে ভোটের প্রচার করতে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

ভেবেচিন্তে ভোট দিন

ধরণীধর মণ্ডল

দলতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রচেষ্টায় 'জোটতন্ত্র' চালু হয়েছে এবং সত্যিকারের গণতন্ত্র এখন শুধু কাগুজে বাঘে পরিণত হতে চলেছে। এর সুযোগ নিন

জোটতন্ত্রে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্তরের নেতা-কর্মীসমূহ আর সর্বস্তরের আমলারা। সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে তো সবারই এসব জানা।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে দল 'স্ক্রিনিং' আরম্ভ করে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মীদের দল থেকে বহিষ্কার, নির্বাচনে অংশ নেবার অনুমতি না দেওয়া, নতুন মুখ এনে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কিন্তু 'ডাল মেঁ কুছ কালা' থেকেই যাচ্ছে। কারণ নতুন মুখ দেখাতে সকল দলেরই নেতা, সাংসদ, মন্ত্রী বা বিধায়দের পরিবারের সদস্য—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শাশুড়ী, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, ভাগ্নি এমনকী বাড়ীর কাজের লোককেও টিকিট দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে লাইন দিচ্ছে। দলতন্ত্রে নেতাদের চাতুর্যের ফলে ফুলন দেবী সাংসদ হয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়তো প্রধানমন্ত্রীও হতে পারতেন। নিন্দুকরা বলে রাবড়ীদেবী নাকি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইংরেজীতে নিজের নাম সহিটা শিখেছিলেন। এরূপ আরও অনেক মূর্খ, অর্ধ-শিক্ষিত, চোর, ডাকাত, নরঘাতক, ঘুষখোর, দাগী আছেন সংসদে ও বিধানসভায়—এটাতো অনেকেরই জানা। ''পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'' এই মহাবাক্য অনুসরণ করে বহু নারী শিবরূপা গণদেবতার বক্ষোপরি নৃত্যপরায়ণা মহানায়িকা। তাঁদের নির্দেশমত পরিবর্তন-ঘোড়ায় চড়ার সাধ মেটানোর পরিবর্তে মরা ঘোড়া ঘাড়ে নিয়ে আনন্দ করতে থাকুক 'দলের পিছনে থাকা মানুষগুলো'। আর গাইতে থাকুক 'হায়! উল্টো বুঝলি রাম...'

প্রত্যেক দলই নতুন মুখ আনার তাগিদে দলের সত্যিকারের কর্মী, যারা ২য়, ৩য় স্তরে আজীবন কাজ করে গেছেন, আজ তারা উপেক্ষিত। কিংবা সামান্য ছুতোনাতায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। সেইসব বহিষ্কৃত, ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে দলের নির্দেশ অমান্য করে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে দলের বিরুদ্ধেই লড়তে বদ্ধপরিকর। নিজেদের ক্ষমতা-দক্ষতাবলে এঁদের অনেকেই পাশ করবেন নিশ্চয়ই। এরূপ দলছুটরা যদি ১৫/২০টা আসনে নির্বাচিত হতে পারেন তবে 'নির্জোট' আন্দোলনের মতো তাঁরাও যদি একটা জোট গঠন করতে পারেন তবে বিধানসভায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। কারণ রাজনীতিতে নীতির কোন বালাই থাকে না। ক্ষমতার লালসায় অচ্ছুৎ বা সাম্প্রদায়িক শব্দগুলি উধাও হয়ে যায়। তাই নতুনভাবে জমিদারতন্ত্রের পুনরাগমন যাতে রোখা যায়, তারসঙ্গে 'উত্তরাধিকার' তন্ত্রেরও প্রতিবাদ করুন, 'পরিবার তন্ত্র'কে প্রতিরোধ করুন।

একটা পরিবর্তন চাইছে সবাই—আমজনতা থেকে সর্বস্তরের শীর্ষস্থানীয় সুধীসমাজ, এমনকী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও। কিন্তু ঈপ্সিত পরিবর্তনের রং-ঢং-বিষয় সম্বন্ধে অনেকেরই মনে স্বচ্ছ বা স্পষ্ট ধারণা নেই। কেউ চাইছে শাসকদলের পরিবর্তন, কেউ কেউ শিল্পনীতি, জাতীয় শিক্ষা নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সার্বিক পরিবর্তন, কেউ বা গোষ্ঠীগত, ধর্মীয়, সামাজিক অধিকার পদ্ধতির প্রয়োগ নীতির, কেউ চায় শুধু দলীয় নেতৃবর্গের চারিত্রিক পরিবর্তন, আর কোনও কোনও অর্বাচীনদের কাম্য পরিবর্তন— পরবর্তী অধ্যায়ে কেবলমাত্র মজা উপভোগের আনন্দ। কোনও কোনও দল মুখে একরকম কথা বলে, আর কার্যক্ষেত্রে দলীয় মতবাদ চালু রেখে উন্নততর পরিবর্তন আনতে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহল, দেগঙ্গা, নেতাই কাণ্ড ইত্যাদি বহুবিধ অবাঞ্ছিত ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সকল দলের নেতারাই নিজেদেরকে একমাত্র দেশসেবক, জনগণের একমাত্র পরিত্রাতা ও তাদের দলই কেবল ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রক্ষায় অগ্রণী বলে জাহির করে। এসব প্রমাণের জন্য দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার আসর সরগরম হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন দলগুলো ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থের অপচয় ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিপথে চলবার রসদ সরবরাহ করে থাকে। ফলে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণের মতো দলীয় নেতৃবর্গের ভাষা, উক্তি বাক্য, নীতি, চরিত্র, মুসলিম তোষণ, ক্ষমতা, বডি-ল্যাংগুয়েজ প্রভৃতিতে এমনকি ময়দান, সড়ক, অবরোধ ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে দূষণ-মাত্রার পারদ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। এই চরম পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরীহ জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভোটদানে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু বিধানসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবার পর অবশ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু নির্বাচন কমিশন শুধু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য যেসব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন তাতে জনগণ অনেকখানি আশ্বস্ত বোধ করছে।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই এদেশে দলতন্ত্র কায়েম হয়ে যায়। আর বর্তমানে গণতন্ত্রের আবরণে

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

ষোড়শ মহাজনপদ

অস্মক

গোপাল চক্রবর্তী

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদের একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অস্মক। এই জনপদের অবস্থান সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে এই রাজ্যটি গোদাবরী তীরে অবস্থিত ছিল। পাণিনীও অস্মকগণের উল্লেখ করেছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য এবং কলিঙ্গের উল্লেখ করায় তাঁর অস্মক দাক্ষিণাত্যের 'অস্মক' হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। 'অর্থশাস্ত্রে'র টীকাকার ভট্টস্বামীন অস্মক মহারাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কারও কারও মতে অস্মক বলতে হয়তো গ্রীক লেখকদের উল্লেখিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'আস্সাকেনয়' রাজ্যটি বোঝাত। ডঃ রায়চৌধুরী এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে 'অস্মক' শব্দটির অর্থ যদি হয় প্রস্তরময় অঞ্চল তাহলে এই নামটি কিছুতেই 'আস্সাকেনয়' রাজ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। কেননা কেমব্রিজের ভারত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে যে 'আস্সাকেনয়' নামের সঙ্গে সংস্কৃত 'অশ্বের' বা ইরানীয় 'আস্পের' যোগ আছে। তা যদি হয় তবে প্রস্তরময় অস্মককে অশ্ববহুল 'অস্সাকেনয়' বা 'অশ্বক' থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। অতএব পাণিনীর সূত্রে যে অস্মক-এর উল্লেখ আছে তার অবস্থান দাক্ষিণাত্যে ছিল বলে মনে করতে হবে। এর রাজধানী ছিল 'পোতালি'। মহাভারতের 'পাউদন্য'ই হচ্ছে 'পোতালি' বা পোটালি। দক্ষিণাপথে আরও একটি 'অস্মক' দেশের কথা জানা যায় 'সুওনিপাত' গ্রন্থে। 'আস্মক' অলকা বা মুলকার খুব কাছাকাছি। কলিঙ্গের দন্তপুরার রাজা এবং পোটালীর রাজার মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। মহাকাচ্চায়ন এক অস্মক রাজাকে দীক্ষিত করেন। রাজা খারবেলের হস্তি গুম্ফার একটি শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি অস্মকদের ভীতি উৎপাদনের জন্য পশ্চিমে এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ''চুল্লকলিঙ্গ'' জাতকের অস্মক এবং হস্তিগুম্ফার ঐসিকানগর সম্ভবত সুত্তনিপাতের অস্মকই। স্থানটি গোদাবরীর তীরে চিহ্নিত হয়েছে। অস্মক হচ্ছে সংস্কৃত অস্মক বা অশ্বক যা অসঙ্গ তাঁর সূত্রালংকারে সিন্ধু মোহনার একটি দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। তাই অসঙ্গের 'অস্মক'-এর সঙ্গে গ্রীকদের 'অস্সাকেনয়' এর মিল পাওয়া যায়। এই স্থানটি সরস্বতীর পূর্বে সমুদ্র থেকে ২৫ মাইল দূরে সোয়াত উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে অস্মক উত্তর-পশ্চিমের একটি রাজ্য। প্রাচীন পালি গ্রন্থ সমূহে 'অস্মক'কে সব সময় অবন্তীর সঙ্গে জড়িত বলে দেখানো হয়েছে।

যা হোক অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও একথা ঠিক যে এই জনপদে প্রাচীন ইক্ষ্বাকু বংশীয়রা রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়। এই কথাও অনেকে মনে করেন যে দক্ষিণ ভারতে 'অস্মক'ই ছিল একমাত্র আর্য জনপদ।

নিজের উপর আস্থা এবং মনের জোর

কিছুদিন ধরে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না নিখিল। কোনও কাজ করতে গেলে ভুল হয়ে যাচ্ছে। কোথায় কি রাখছেন মনে থাকছে না। একই কাজ দুবার করে ফেলছেন। কথায় কথায় এর ওর উপর রেগে যাচ্ছেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ চোখ ভালোভাবে লক্ষ্য করেন বার বার। কোথাও কি পাল্টে গেছে! না, সেই এক মুখই তো রয়েছে। অনেকদিনের চেনা মুখ। কতবছর ধরে আয়নায় মুখ দেখছেন? হিসেব করার চেষ্টা করলেন। গুলিয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা হিসেবে পৌঁছোলেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে সচেতনভাবে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছেন। পাঁচ বছর বয়স ছিল কত বছর আগে? ভাবতে পারছেন না? একটু কষ্ট করে ডায়েরিটা খুললেন।

এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখে জন্মদিন। গত ১৫ এপ্রিল কত বছর জন্মদিনের? সে হিসেবও নিতে ভালো লাগল না। নিখিল বসলেন চেয়ারে। একটা গান মনে করার চেষ্টা চলল কিছুক্ষণ। 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি...' পরের অশংটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। আলমারিতে 'গীতবিতান' আছে। খুললেই পুরো গানটা পড়া যেতে পারে। নিখিল মনে করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভাবলেন ছোট ভাইকে একটা চিঠি লিখবেন পোস্টকার্ডে। দুতিনটে লাইন লেখার পর আর লিখতে ইচ্ছে করল না। টেলিফোন করলেই কথা বলা যায়। চিঠিটাই লিখবেন ভাবলেন। এখন না হোক পরে হবে। টেবিলের উপর নতুন দুতিনটে বই পয়লা বৈশাখের আগে দিয়ে গেছে ভাইঝি। ভাইঝির পোষাকি নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। এক্ষুনি দুএকজনকে ফোন করলেই রিঙ্কুর পোষাকি নামটা মনে আনা যায়। যাক পরে মনে পড়তে পারে।

এরকম অবস্থাটা নিখিলের ছিল না। ঝকঝকে স্মৃতি নিয়ে নানান কাজ করতেন। কোন ঘটনা বা কারও নাম অন্যের মনে না পড়লে ধরিয়ে দিতেন ঠিক সময়ে। কেউ কিছু লিখে একবার যাচাই করে নিত নিখিলকে একবার চোখ বোলাতে অনুরোধ জানিয়ে। এখন অবসাদের মধ্যে থাকেন। কিছু ভালো লাগে না। মনে রাখতে চান না কিছু কিংবা পারেন না। এই ভুলো মনের জন্যে অনেকরকম অসুবিধে হয়। অনাত্মীয়রা হাসাহাসি করে। অনেকের উপহাসের পাত্র হয়েও নিখিল নিজেকে পাল্টাতে পারেন না। আত্মীয়বন্ধুরা যথেষ্ট চিন্তিত হয়। ভাবে, কেন এরকম হচ্ছে। কোথায় কষ্ট, অসুবিধে, সমস্যা? তাদের প্রিয়জন নিখিলের মস্তিষ্ক কি ঠিকভাবে কাজ করছে না? স্নায়ুগুলো কি অকেজো হয়ে যাচ্ছে? নানারকম পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা চলে। ফলে এটা সেটা খাওয়ার কথাও বলে কেউ কেউ। আবার কেউ একটু আগ বাড়িয়ে বলে, নিখিলকে কেউ যাদুটোনা করে ঐরকম বানাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে সব ভুলে যাবে। তখন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

নিখিলের পুরনো বন্ধু অরিন্দম নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন বিভিন্নজনকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবলেন নিখিলের ভাই অখিল। অখিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর আস্থা রাখেন। মনোবিজ্ঞানকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন। অরিন্দম মনোবিজ্ঞানী। নিখিল এখন মানসিক-সংকটের মধ্যে রয়েছে এটা অরিন্দম খবর পেয়েছিলেন আগেই। তবে বাড়ির কারও গরজ ছাড়া আগ বাড়িয়ে বন্ধুকে দেখতে চাননি। অখিল জানাতেই অরিন্দম বললেন, নিখিলকে নিয়ে একদিন এসো আমার কাছে।

দুদিন বাদেই নিখিল এলেন অরিন্দমের কাছে ভাইয়ের সঙ্গে। অরিন্দম স্কুলজীবনের অনেকগুলো ম্যাগাজিন রেখেছিলেন ঘরে। কয়েকটা ছবিও। নিখিল স্পষ্ট মনে করতে পারলেন স্কুলের অনেক ঘটনা। অরিন্দম বললেন, 'তোর মনে পড়ে আমাদের সেই প্রার্থনা গান?' 'নিখিল বললেন, 'দাঁড়া মনে পড়ছে।' নিখিল বললেন আস্তে আস্তে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন অরিন্দম নিখিলের সঙ্গে। অখিল সামনে ছিলেন না। যাওয়ার সময় অখিলকে ডেকে অরিন্দম বললেন, 'তোমার দাদা ঠিকই আছে। ওকে একটু নিজের মতো থাকতে দাও। অনুশীলন করুক মনঃসংযোগের। ওই জিনিসটা কোনও কারণে কমে গেছে। সেটা ফেরাতে হবে। ওষুধে নয়। গান শুনিয়ে আর নানান বই পড়িয়ে। আমি কিছু গান শোনা আর বই পড়ার জন্য বলেছি।'

নিখিলকে নিয়ে অখিল কয়েকটি সিডি কিনলেন রবীন্দ্রনাথের গানের। যে গানগুলো তাঁর দাদা শুনতে ভালোবাসতেন। পুজো পর্যায়ের গান। আর বইপাড়া থেকে কিনলেন রবীন্দ্রনাথের লেখা 'মানুষের ধর্ম' বইটা।

কদিন বাদে দেখা গেলো নিখিল গাইছেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব, ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।'

সেদিন বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফিরেছিল ভাইঝি রিঙ্কু। জ্যেঠুর ঘরে ঢুকতেই নিখিল বলল, আসুন নবনীতা, আমাদের ছোট্ট রিঙ্কু।

রিঙ্কুর ভালো নাম নবনীতা এটা মনে করতে পারছিল না কদিন আগে নিখিল। ভাইঝি বলল জ্যেঠুকে, গানটা শেষ করো।

নিখিল ভরাট গলায় গাইতে থাকল—আমারে তুমি অশেষ করেছ...।

কেরিয়ারের ঠিকঠিকানা

পানীয় ঘিরে পেশা

(বারটেন্ডিং ম্যানেজমেন্ট)

*কর্মব্যস্ত মানুষ ক্লান্তি কাটাতে এবং একটু উষ্ণ সান্নিধ্যের খোঁজে, যেখানে বিনোদন, বিশ্রাম দুই-ই মেলে, পাওয়া যায় ভিন্ন জীবনের স্বাদ, পানীয়ের ককটেল—এ ধরনের বার-হোটেলে আমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জন করাই হলো বারটেন্ডিং। এই ব্যতিক্রমী পেশার কথা জানাচ্ছেন **নীল উপাধ্যায়**।*

বার ম্যানেজমেন্ট বর্তমানে একটি জনপ্রিয় পেশা। চাহিদা থেকেই শহরে বাড়ছে গেট-টু-গেদার পার্টি ও বার। এসব আসরে অবাধে চলে পানীয় ককটেল। ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই কাজে চাহিদা যথেষ্ট। কিছুদিন আগেও এধরনের পেশা নিয়ে কেউ কেরিয়ার তৈরি করার কথা ভাবতেন না। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই বারটেন্ডিং সম্পর্কে আগ্রহও প্রচুর।

যোগ্যতা ঃ বারটেন্ডিং শিল্পে কাজ করার জন্য নিম্নতম যোগ্যতার প্রয়োজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ। মাতৃভাষা ছাড়া আরও দু'একটা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা থাকা চাই। হোটেলে কাজ করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

কী কাজ করতে হয় ঃ (১) অতিথি আপ্যায়ন (২) নানা ধরনের পানীয়ের ককটেল তৈরি (৩) নৈপুণ্যের সঙ্গে পানীয় পরিবেশন (৪) অতিথিদের মনোরঞ্জনে আপ্লুত করা।

রোজগার ও কাজের ক্ষেত্র ঃ পূর্ণ-সময়ের বা আংশিক সময়ের কাজ করা যায়। পূর্ণ-সময়ের চাকরির সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন শপিং মলের বার ও ডিস্কো থেক-এ। প্রাইভেট পার্টিতে ফ্রিল্যান্সিং করেও আয় করা যায়। কলকাতার বাজারে বারটেন্ডারদের শুরুতে মাইনে ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা। অভিজ্ঞতা বাড়লে এই আয় বাড়তে পারে প্রচুর।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ হয়। আগ্রহীরা বারগুলিতে কোর্স অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন।

ট্রেনিং ঃ বিশেষ কাজ নেওয়ার আগে ট্রেনিং নেওয়া জরুরি। বারটেন্ডিং বা বার—ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং-এর সুরা শিল্পের যাবতীয় বিষয় শেখানো হয়। এর মধ্যে ৩ থেকে ৬ মাসের একটা সময় বরাদ্দ থাকে যখন প্রার্থীদের সরাসরি ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে কাজ শেখানো হয়, যাতে তাঁরা শিল্পের চাহিদা বুঝতে পারেন।

কোথায় ট্রেনিং ঃ অ্যাকাডেমি অব্ বারটেন্ডিং অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও কেনিলওয়ার্থ এ্যাকাডেমি অব্ বার ম্যানেজমেন্ট।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

ভোটের কাজে পায়রা

দেশের মধ্যে একমাত্র ওড়িশাতেই রয়েছে পুলিশের পায়রা-শাখা। বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পায়রাগুলিকে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে ২৯টি পায়রা-খোপে। ভোটের সময় জরুরি কোনও বার্তা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে পায়রা উড়ে যায় প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে। কালাহান্ডি, কোরাপুট, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল প্রভৃতি জেলার চারপাশে। পাহাড়, গভীর গিরিখাত এবং ঘনজঙ্গলের জন্য একমাত্র প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পায়রাই যোগাযোগের মাধ্যম। ওড়িশার ভোটে ডিউটি দিতে বকবকম পায়রার দলকেও নিযুক্ত করা হয়।

এবার বেড়াল

সাপ খেয়ে খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছিল মানুষ। ইঁদুর খাবে কে? ফসলের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল। চীনের ওয়াংদং প্রদেশের আনজিয়ানের গ্রামসভা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, বেড়াল কিনে এনে ফসলের মাঠে ছেড়ে দেওয়া হবে। দুশোর ওপর বেড়াল কেনা হয়; খরচ পড়ে সাড়ে আটশো ডলার। ২৫০ একর জমিতে ইঁদুর সাবাড় করে বেড়ালেরা মাঠের ধানে গোলাভরা নিশ্চিত করেছে। সেই আনন্দে সম্প্রতি বেড়ালদের জন্য ডাকা হয়েছিল একটি ভোজসভা। রকমারি মাছের মোচ্ছবে বেড়ালেরা মেতে উঠেছিল।

মশকমঙ্গল গীতিকা

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে ছোটমেয়ে মীরাকে লিখছেন, 'এখানে বেশ গরম পড়েচে।...সেই সঙ্গে যথেষ্ট মশার উপদ্রব। জাপানি মশাগুলো আমাদের বাঙালি মশার চেয়ে ঢের বড়, ডাকে কম, কামড়ায় বেশি।' সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ মশাকে বিরস বিরক্তিতে দেখেননি, দেখেছেন পরিহাস রসিকতায়। পরে বলেছেন, 'মনে স্থির করেছি ম্যালেরিয়া বধ নামে একটা মহাকাব্য লিখব তাতে কুইনিনকে করব প্রধান নায়ক। শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য তিনি লেখেননি, শেষ বয়সে লিখেছেন দুটি সরস পদ্য— তার মধ্যে একটি হলো মশকমঙ্গল গীতিকা'।

রঙ্গকৌতুক

রবি ঃ ইংরেজদের সমাজে তো একান্নবর্তী পরিবার নেই, তাহলে কথাটার ইংরেজি কী হবে বল্ তো।

কবি ঃ কেন, ফিফ্‌টি ওয়ান ফ্যামিলিজ!

* * *

শিক্ষক ঃ নিউইয়র্কের বন্দরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দাঁড়িয়ে থাকে কেন বলতে পারিস?

ছাত্র ঃ হ্যাঁ স্যার, তাকে তো কেউ বসতে দেয় না।

* * *

স্বামী ঃ মনে আছে, কলেজের দিনগুলো! একটা ভ্যালেন্টাইনে আমি তোমায় সাতটা কবিতা দিয়েছিলাম!

স্ত্রী ঃ তখনও সফ্‌ট ছিলে যে, সফ্‌টওয়্যারে তো ঢোকনি!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। 'চেরাপুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে' এই বিখ্যাত পংক্তিটি কোন্ বিখ্যাত কবির—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত?

২। কোন্ কোন্ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা হয়নি? এবং কেন?

৩। কোন্ দেবতার অস্ত্র 'বজ্র'—বরুণের না ইন্দ্রের?

৪। 'প্রাবৃট' কথাটার অর্থ কী—মেঘ, বৃষ্টি না বর্ষাকাল?

৫। গুপী গাইনের বাবার নাম কী ছিল?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ ১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ২। ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য। ৩। ইন্দ্রের ৪। বর্ষাকাল ৫। কানু বাইন

সমাবেশ সমাচার

মালদায় বাসন্তী পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠান

গত ১০ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার ঐতিহাসিক ও প্রাচীন তীর্থস্থান পাতালচণ্ডী পীঠে ও পার্বত্য শাখার সংলগ্ন সাগরদিঘি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রীশ্রী বাসন্তী পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠান। পাতালচণ্ডীতে তিনদিনব্যাপী নরনারায়ণ সেবা ও দেবী ভাগবত পাঠ করা হয়। অনুন্নত পার্বত্য ও সাগরদিঘিতে শ্রীশ্রী বাসন্তী পুজো উপলক্ষে বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা বহুমানুষকে নিয়ে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা উপলক্ষে প্রতিবছরই দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনরা এসে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হন। আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা দু'টি স্থানেই তাঁদের সেবা করে থাকেন। এছাড়াও সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিবছরের মতো এবারও বাসন্তী পুজো উপলক্ষে নবমীর দিন মহাযজ্ঞ ও হিন্দুধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হুগলীর কুলগাছিতে সঙ্ঘের শিবির

গত ১৭ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলি জেলার গ্রামীণ মহকুমার একদিনের শিবির কুলগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো। শিবির শুরু হয় ওইদিন বিকেলে এবং পরদিন সকাল ৬টায় শেষ হয়। শিবিরে যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল ৮৭ জন। মহকুমার কার্যকর্তারা এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষক কমলাকান্ত আচার্যের ব্যবস্থাপনায় শিবির সম্পন্ন হয়। সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ দীপাঞ্জন গুহ এবং জেলা প্রচারক তাপস বারিক শিবির পরিদর্শন করেন।

সামবেদ নিয়ে জাতীয় সেমিনার

সামবেদের মাহাত্ম্য আবার নতুন করে প্রচার করার উদ্দেশ্যে অতি সম্প্রতি শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে এবং গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের সহযোগিতায় একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো।

চুঁচড়ায় রামনবমী উদ্‌যাপন

গত ১২ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় রবীন্দ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সারা দিনব্যাপী রামনবমী উৎসব পালিত হলো। সকালে মহিলাদের একটি শোভাযাত্রায় প্রত্যেকে কলসভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে উৎসব স্থানে সমবেত হন। সেখানে বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের শ্রীমদ্ তিতিক্ষানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। বিকেলে জনাকীর্ণ ধর্মসভায় রামনবমী উৎসবের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং আধুনিককালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, মৃণাল কাঞ্জিলাল, প্রফুল্ল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ, বিশ্বনাথ সাহা প্রমুখ। সভার অব্যবহিত পূর্বে কয়েক শো' লোকের একটি শোভাযাত্রা বিভিন্ন বাদ্য ও আয়ুধ (অস্ত্র) সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিহিত অঞ্চলগুলি পরিক্রমা করে যাতে স্থানীয় অধিবাসীগণের যোগদান এবং উৎসাহ ছিল লক্ষ্যণীয়। অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় পাঁচশ' লোক খিচুড়ি প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন।

গত ২৫ মার্চ সকালে বৈদিক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি আল্পনা সেনগুপ্ত। এরপর অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস. সুদর্শন শর্মা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের সম্পাদক স্বামী সর্বভূতানন্দজী মহারাজ মুখ্য অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক ব্রজবিহারী চৌবে, আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টী ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, মহর্ষি সান্দিপনী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সদস্যসচিব অধ্যাপক রূপকিশোর শাস্ত্রী-প্রমুখ বিদগ্ধজন। সংসদ সভাপতি ডঃ গোপাল মিশ্র অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন।

বহরমপুরে সঙ্ঘকার্যালয়

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে সঙ্ঘ কার্যালয় 'মাধবভবন' নির্মিত হলো। গত ৪ এপ্রিল বর্ষপ্রতিপদের দিন কার্যালয়ের উদ্বোধন ও ভারতমাতার মূর্তিতে মাল্যার্পণ করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুপ্রভানন্দজী মহারাজ ও আর এস এসের পূর্ব ক্ষেত্র সংঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্ঘের কাজের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক দুর্গাদাস রায়চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা সুনীলপদ গোস্বামী।

হোম পূজা যজ্ঞের পরে সহস্রাধিক স্বয়ংসেবক পরিবারসহ মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় নতুন ও পুরাতন প্রচারক মিলনের কার্যক্রম হয়। নতুন বস্ত্র দিয়ে প্রচারকদের সম্মান জানানো হয়।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল, সহ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জি, সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যোৎ মৈত্র, জেলা সঙ্ঘচালক সমর রায় প্রমুখ। রাত্রে বর্ষপ্রতিপদ উৎসবের প্রেক্ষিতে

সমাবেশ সমাচার

সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার।

সেবাভারতীর পাঠ্য-সামগ্রী বিতরণ

পার্থবর্মা॥ জেলাজুড়ে রাজনৈতিক দৌড়ঝাঁপের মাঝে নিঃশব্দে নীরবে গত ১৩ এপ্রিল সেবাভারতীর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ শাখা স্থানীয় সারদা শিশুতীর্থ প্রাঙ্গণে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের হাতে তুলে দিল খাতা-কলম। সপ্তম শ্রেণী থেকে স্নাতক ২য় বর্ষ পর্যন্ত ১৬ জন ছাত্রের হাতে পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেন অজিতকুমার পাল ও শিশুতীর্থের প্রধান আচার্য সুনীল রায়। সেবাভারতীর তুফানগঞ্জ শাখার এই মাসিক প্রকল্পের শুভ সূচনাকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদের পাশে থেকে সেবাব্রতী হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গৌতম চক্রবর্তী।

চাঁচলে অর্শ চিকিৎসা শিবির

সেবা ভারতীর উদ্যোগে গত ১৩ মার্চ উত্তর মালদা জেলার চাঁচল মাড়োয়ারী ধর্মশালাতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অর্শ-চিকিৎসা শিবির। এই শিবিরে চিকিৎসা করান ১৪২ জন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ টি এম তেওয়ারী এঁদের চিকিৎসা করেন।

সেবা ভারতীর জলসত্র

নববর্ষের দিন বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে আগত অসংখ্য পুণ্যার্থীদের জন্য জলসত্র ও বাতাসা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন আর এসের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, অধিবক্তা পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সম্পাদক জয়দীপ রায়, পূর্ব রেলের মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা সরস্বতী যাদব ও বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর সাধারণ সম্পাদক তরুণ কান্তি ঘোষ প্রমুখ। ছবি : কৃষাণু মিত্র।

মঙ্গলনিধি

গত ৭ মার্চ মালদা জেলার অনুপনগর মালতীপুরের স্বয়ংসেবক এবং প্রাক্তন প্রচারক কৌশিক মণ্ডলের বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পরিবার ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি আর এস এসের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে অর্পণ করেন।

ধূলাগড়ীতে স্বয়ংসেবকদের জলসত্র

হাওড়া জেলার ধূলাগড়ী আটচালাতে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে ২৪ প্রহর হরিসেবা। এই হরিসেবার শেষ (ভোগের দিন) দিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় এই গ্রামে।

জল- বাতাসা দিয়ে তৃষ্ণার্ত ভক্তের তৃষ্ণা দূর করে আসছে ধূলাগড়ী আটচালা শাখার স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘ ১২ বছর ধরে। একইভাবে এবছরও আটচালা শাখার স্বয়ংসেবক সনৎ খাঁর নেতৃত্বে জল-বাতাসা দেওয়া হয়।

***

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শেখর রঞ্জন সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ শৌভিক সিংহ ও পারমিতার বিবাহ উপলক্ষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এক বৈবাহিক অনুষ্ঠান শেখরবাবু সামাজিক কাজের জন্য এক হাজার এক টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে যোগেন্দ্রনাথ দাস

হিন্দু মহাসভার কাজে ব্রতী সঙ্ঘ পরিবারে সুপরিচিত যোগেন্দ্রনাথ দাস গত ২৮ মার্চ, মেদিনীপুর শহরে নিজ বাড়ীতে চুরাশি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হিন্দু মহাসভার অজিত চট্টোপাধ্যায়, জনসঙ্ঘের মুক্তেশ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মদনমোহন মল্লিক প্রমুখের সান্নিধ্যে এসে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। পারিবারিক ও আর্থিক বিপর্যয়ে তিনি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। তাই ষাটোর্ধ্ব যোগেন্দ্রনাথ নব্বই-এর দশকে শ্রীরামজন্মভূমিতে করসেবার লক্ষ্যে যাত্রা করেন এবং মোগলসরাইতে গ্রেপ্তার হন। অযোধ্যায় ধাঁচা ধ্বংসের পর যোগেন্দ্রনাথকে বাড়ী থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি বেশ কিছুদিন স্বস্তিকা পত্রিকার এবং বিশ্ব হিন্দুবর্তার বিক্রয় প্রতিনিধি ছিলেন। স্বল্প রোগভোগের পর দুই পুত্র, দুই কন্যা, নাতিদের এবং অজস্র গুণমুগ্ধ রেখে অনন্তলোকে যাত্রা করলেন।

***

গত ১০ মার্চ দুপুরে মধ্য আন্দামানের শান্তানুতে নিজ বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান চিত্র-শিল্পের পত্রিকা 'আর্ট ডিসকভারি'র স্বত্বাধিকারী প্রকাশক সুবল বিশ্বাস। তাঁর পুত্র সমীর বিশ্বাসও একজন সাহিত্যিক।

***

গত ৫ এপ্রিল সকালে সঙ্ঘের মালদা জেলার সামসী মহকুমা কার্যবাহ সাগর দাসের পিতৃদেব কমলাকান্ত দাস ৭৩ বছর বয়সে মহদীপুরস্থিত গ্রামের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী সহ এক পুত্র ও তিন কন্যাকে রেখে গেলেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক তথা স্বস্তিকার প্রচার বিভাগের কর্মী শ্যামল বর্মনের মাতৃদেবী জোনাকী বর্মন গত ১০ মার্চ কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার পুটিমারীর নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। বর্তমানে তিনি রেখে গেছেন ৩ পুত্র, পুত্রবধূসহ নাতি-নাতনীদের।

এবারের বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল ৫-০ না ০-৫?

শিবাজী গুপ্ত

নামে পাঁচটি হলেও প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন হতে যাচ্ছে চারটি রাজ্যে। কারণ, পুদুচেরীকে রাজ্য বলা আর চামচিকাকে পাখি বা জোনাকীকে হ্যাজাক লাইট বলার মতোই হাস্যকর। বাকী চারটি রাজ্যের মধ্যে দুটি সিপিএম নিয়ন্ত্রিত, একটি কংগ্রেস পরিচালিত (অসম) এবং অপরটি (তামিলনাড়ু) দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে কংগ্রেস সমর্থিত ডি. এম. কে. পরিচালিত সরকার। মোদ্দা কথা, পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটি কংগ্রেসী সরকার (পুদুচেরী ধরলে দুটি)।

সরকারি বিজ্ঞাপন-পুষ্ট খবরের কাগজগুলি এখন থেকেই ট্যাঁড়া পেটাতে শুরু করেছে যে, আসন্ন নির্বাচনে সোনিয়া গান্ধী পদাশ্রিত কংগ্রেস ৫-০ গোলে বিরোধীদের হারাবে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ-বাণীর যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, তা তো পাগলেও বোঝে; বোঝে না চাটুকার সংবাদপত্রগুলি। তারা রাজমাতা সোনিয়া গান্ধীর মনোরঞ্জন করতেই ব্যস্ত; তাই কংগ্রেস ৫-০ গোলে নির্বাচন জিতবে বলে তাদের আরাধ্য দেবীর দিল্ খুস করতে লেগেছে।

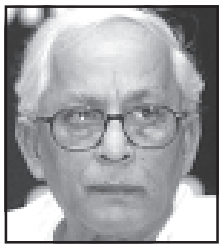
বুদ্ধদেব

গঙ্গে

অচ্যুতানন্দন

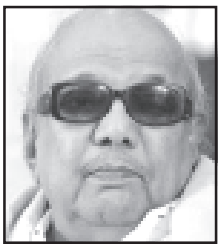
করুণানিধি

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রসব হবে এবারের নির্বাচনে। অসম থেকেই পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু করা যাক। সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়াশীল ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সঙ্গে প্রকাশ্যে ও গোপনে গাঁটছড়া বেঁধেও তরুণ গগৈর নির্বাচনী-ভেলা ব্রহ্মপুত্রে তলিয়ে যাবে বলেই ভোট-বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ফল হবে-এক-০। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম হারলে কংগ্রেসের আহ্লাদিত হবার কিছু নেই; ফয়দা তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস—যে দলের নেত্রী কংগ্রেসের ভিটায় ঘুঘু চরাতে বদ্ধ পরিকর। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সাইনবোর্ড পার্টিতে পরিণত হবে। ফলে কংগ্রেসের ভাগ্যে—জোড়া ০০ (শূন্য)।

তামিলনাড়ুতে জোটের বড় শরিক করুণানিধির ডি এম কে নিজের পাপে নিজেই ডুববে। সে সঙ্গে গলায় বাঁধা কলসীর মতো কংগ্রেসকেও ডোবাবে। ফলে কংগ্রেসের কপালে—তিনশূন্য—০০০।

কেরলে ঐতিহ্যানুযায়ী পাঁচ বছর পর শাসনক্ষমতা পরিবর্তন ঘটলেও কংগ্রেসের এককভাবে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা নেই; মুসলীম লীগ ও খৃস্টান দলগুলির মতো প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে জোট বেঁধে ইউ ডি এফ ক্ষমতায় এলেও তাকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বলা তো যাবে না— জোটের জঙ্গলে কংগ্রেস হারিয়ে যাবে। ফলং—চারশূন্য—০০০০।

বাকী রইল পুদুচেরী—যার এক্তিয়ার পশ্চিমবঙ্গের কোনও পৌরসভার সমতুল—তাকে রাজ্য বললে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যকে হেয় করা হয়। কংগ্রেস এককভাবে সেখানে ক্ষমতায় এলেও তাকে রাজভোগের বদলে লজেন্স পাওয়ার মতো সান্ত্বনা পুরস্কারই বলা যায়। শেষমেশ বোধহয় কংগ্রেসের ভাগ্যে ৫-০'র বদলে ০-৫ই জুটবে। সারাদেহ কলঙ্কের অলঙ্কারে ভূষিত কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে কোনও বিবেকবান ভোটারই নিজেকে কলঙ্কিত করবে না—একথা নিশ্চিত।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

—— ব্যবস্থাপক

বিশ্বনাট্যদিবসে সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন।। ১৫০ জন শিশু-কিশোর, বয়স যাদের তিন থেকে চোদ্দ, গানে-নাচে অভিনয়ে মাতিয়ে দিল সারা সন্ধ্যা। প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের জায়গা নেই। গত ২৭ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় এই দৃশ্যই দেখা গেল বাগবাজারের গিরিশ মঞ্চে। প্রতি বছর বিশ্বনাট্যদিবসে বয়স্ক নাট্যপ্রেমীরা যখন নানা অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে, তখন সংস্কার ভারতী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিশু-কিশোর নাট্যমেলার আয়োজন করে। এটা তাদের তৃতীয় বছর।

হোলি একাডেমি, মুরারীপুকুর

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায়—ঠিক ঘোষিত সময়ে পর্দা উঠল। মঞ্চে সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত ''সাধয়তি সংস্কার ভারতী, ভারতে নবজীবনম্'' গানের সঙ্গে সংস্কার ভারতী বেহালা শাখার শিশুশিল্পীরা এক অপূর্ব নৃত্যনির্মিতি গড়ে তুলল। পরিচালনায় ছিলেন সুপর্ণা ঘোষাল। এরপর নটরাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নাট্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও পরিচালিকা ভদ্রা বসু। পাঠ্যপুস্তকের ভারে নুয়ে পড়ে ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে তাকাবার সময় পায় না। স্বভাবতই সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি, আমাদের ঐতিহ্য-পরম্পরার প্রতি আকর্ষণ ও রুচিবোধও গড়ে ওঠে না। অথচ এই বেড়ে ওঠার সময়েই এসব ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ গড়ে তোলা দরকার। উদ্বোধকের ভাষণে এই কথাগুলিই বললেন অভিনেত্রী ভদ্রা বসু। সংস্কার ভারতী এমন সুন্দর প্রেক্ষাগৃহে ছোটদের তাদের অনুষ্ঠান করার জন্য মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন—এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মানিকতলা-মুরারীপুকুরের দ্য হোলি একাডেমীর প্রাক্-প্রাথমিক বিভাগের তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা নিবেদন করল কৌতুকনাট্য স্বয়ম্বরে সংযুক্তা। রেকর্ডেড সংলাপের সঙ্গে অপূর্ব দক্ষতায় ক্ষুদে শিল্পীরা নিজ নিজ চরিত্রে অভিনয় করে আসর মাত করল। পরিচালনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন যথাক্রমে অদিতি চৌধুরী ও সুপ্রীতি ভদ্র।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিতে আজ থেকে ২৭ বছর আগে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে গড়ে উঠেছিল সারদা শিশু মন্দির। আজ সমগ্র হাওড়া নগরে এই শিশুমন্দিরের সুখ্যাতি। এদিন সারদা শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য রীতা চক্রবর্তীর সামগ্রিক পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো ''মহিষাসুরমর্দিনী''। বহুশ্রুত ক্যাসেটের সঙ্গে অভিনয় করল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। দর্শকাসনে যে সব ক্ষুদে দর্শক ছিল তাদের দৃষ্টি ছিল মঞ্চের সিংহ, গণপতি ও অসুরের দিকে। মনে হয় এরা একটু নাচনকোঁদন করলে শিশুরা খুশী হোত বেশি।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ অনুমোদিত হাওড়া জেলার আমতার সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছোটরা সবুজায়ন ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরল তাদের অনবদ্য মূকাভিনয়ে। সঙ্গের আবহসঙ্গীত ছিল অপূর্ব। তবে মূকাভিনয়ে গানের সঙ্গে নাচ না দিলেই বোধহয় ঠিক হোত। তবে উপস্থাপনায় স্বকীয়তায় ''অরণ্য'' শীর্ষক এদের অনুষ্ঠানটি দর্শক-উপভোগ্য হয়েছে।

সংস্কার ভারতীর বাগুইআটি শাখার কিশোরেরা সুকুমার রায়ের কৌতুক নাটিকা ''অবাক জলপান'' মঞ্চস্থ করল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত এক পথিকের জল খেতে চেয়ে যে বিপাকে পড়তে হয়েছিল। তাই অপূর্ব অভিনয়ে বাস্তবায়িত করল ক্ষুদে শিল্পীরা। পরিচালনায় ছিলেন সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ দাস।

সবশেষে লেক গার্ডেনস-এর নৃত্য শিক্ষালয় ''প্রতিভা'' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ''বুদ্ধভুতুম'' কে হাজির করল মঞ্চে। মঞ্চের একদিকে কুঁড়ে ঘর আর একদিকে রাজবাড়ীর সিংহদুয়ার। মাঝখানে একটা নৌকা। প্রায় ৪৫ জন বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোর নাচে-অভিনয়ে রূপকথার জগতকে তুলে ধরল আমাদের সামনে। নির্দেশিকা সংযুক্তা সেনগুপ্তকে বাহবা দিতে হয় এতজন ক্ষুদে শিল্পীকে দিয়ে এমন একটি বর্ণাঢ্য প্রযোজনা উপহার দেওয়ার জন্য।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভরত কুণ্ডু।

বাগুইআটি শাখার উপস্থাপনা।

'প্রতিভা'— লেক গার্ডেন্স, কলকাতার শিল্পীদের উপস্থাপনা।

শব্দরূপ-৫৭৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

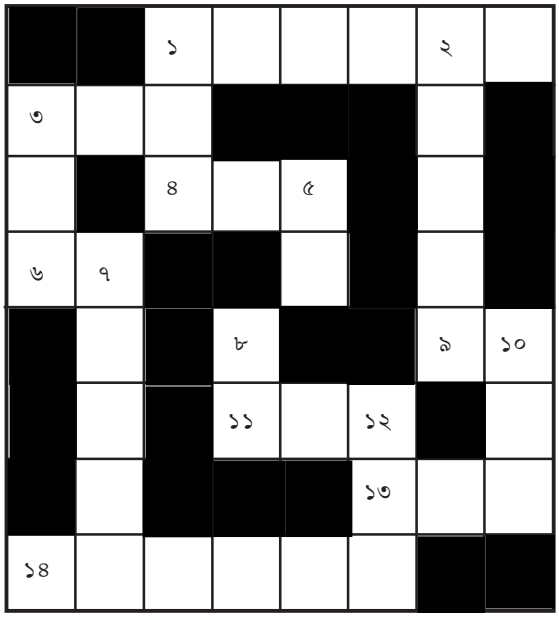

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. কোনও মূর্তি বা বস্তুকে ব্রহ্মার অনুকল্পরূপে কল্পনা করিয়া অর্চনা, **৩.** চঞ্চলা, প্রগলভা স্ত্রী, ধিঙ্গী, **৪.** লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ, **৬.** অগাধ-জল, সংকট, **৯.** যতিচিহ্ন বিশেষ, হ্রাস পাওয়া, **১১.** ভীষণ রবকারী দীর্ঘাকার পেচক বিশেষ, **১৩.** মৌচাকে, ফুলের সাজি, **১৪.** রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান।

উপর-নীচ ঃ ১. রকম, প্রভেদ, **২.** যে শপথ করিয়াছে যে, জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে, **৩.** পরের অশুভকামনা, বিদ্বেষবুদ্ধি, **৫.** মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন, **৭.** যাহাতে সত্য বলিবার জন্য শপথের পাঠ লিখা থাকে, **৮.** সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ, **১০.** তপন, রবি, **১২.** গঙ্গার বাহন, রাশিচক্রের দশম রাশি।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৭৭
সঠিক উত্তরদাতা

শ্যামল বর্মন
সামসি, মালদা
অশোক বসু
নলহাটী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		স্ব	খা	ত	স	লি	লে
পু	ন্না	গ				ঙ্গ	
ষ্প		ত	ম	সা		শ	
ক	পী			স্না		রী	
	র		ঘো			র	মা
	শু		গ	জ	র		রু
	রা				জ	ষ্প	তি
ক	ম	লে	কা	মি	নী		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৭৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ মে, ২০১১ সংখ্যায়

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

১৯৪৮ সালের জন্মাষ্টমীর শুভলগ্নে, বিবেকানন্দ স্মারক সমিতি, কন্যাকুমারিকা'র মহান রূপকার কর্মবীর একনাথ রাণাডের আশীর্বাদধন্য সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র পথ চলা শুরু।

গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ নিয়ে স্বস্তিকা আজ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার ব্লক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেশের প্রতিটি রাজ্যেই আগ্রহী বাঙালী পাঠকের কাছে স্বস্তিকা নিয়মিত পৌঁছায়। বিশ্বের দশটি বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যার মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

তিন প্রজন্ম স্বস্তিকা পাঠ করছেন এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার।

একশোরও বেশি গণ ও শ্রেণী সংগঠনের সঙ্গে স্বস্তিকার ওতোপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে, যার ভিত্তি হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা।

স্বস্তিকা-র গ্রাহক সংখ্যা পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে হলেও পাঠক সংখ্যা পাঁচ লাখেরও বেশি।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিচারে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে যে কোনও প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

জাতীয়তাবাদী এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও যে কোনও ধরনের সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন —

সম্পর্কসূত্র ঃ ৯৩৩২১৫৪৬৮০

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২

Swastika RNI No. 5257/57
2 May - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

Please Think, Think Deeply !

- *Those, Who are Crores in numbers even after Independence and partition on communal basis and are enjoying more than equal rights in Hindusthan and West Bengal, sould be treated as 'Minorities' even to this day?*
- *Most of the political parties are treating them 'Minorities' just to garner votes en-bloc.*
- *This political parties keep 'mum' on Common Civil Code.*
- *Please think deeply, whether 'minority status' and safeguards should be accorded even after 64 years of Independence and partition?*
- *Nationalist Minority brothers also think!!*

CAST YOUR VOTE FOR THE CAUSE OF THE NATION

-- Courtsey --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS'
12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069
Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা